মহানগরীর উপাখ্যান

শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা



সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা ৯

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আপাব সার্কুলাব বোড। কলিকাতা ৯



মুদ্রক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসবস্বতী প্রেস লিঃ

৩২ আপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

পরিবেশক। দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৪।৩ কলেজ স্ট্রিট। কলিকাতা ১২

দাম ২৷৷০ টাকা

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরিত্যক্ত, জনহীন, পঙ্কিল যে পল্লীর পার্শ্বে পরদিন অপরাহ্নে গৌরী-পতির বিশ্বস্ত অনুচরবাহিত শিবিকা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার বীভৎস রূপ সুনন্দা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। বিরামহীন বর্ষার জলধারায় মৃৎকুটিরগুলির অধিকাংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে। বৈশাখী ঝড়ের চিহ্ন বহন করিয়া আচ্ছাদনহীন, বিদীর্ণভিত্তি গৃহগুলি শবের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। একদিন যে এই পল্লীতে মনুষ্যবসতি ছিল, ইতস্ততঃ সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ ব্যতীত তাহার কোন প্রমাণ এখন আর বর্তমান নাই। কিন্তু বারিসিক্ত, পচনশীল সেই আবর্জনাকুণ্ডগুলি হইতে যে দুর্গন্ধ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রভাবে স্থানটি শ্মশানবাসী প্রেতাত্মার বিচরণভূমি বলিয়া বোধ হইতেছে। এই কি আজ একদা ধনী-শ্রেষ্ঠ উমাপতির বাসস্থান? সুনন্দার চক্ষুতে অশ্রুর আভাস দেখিয়া গৌরীপতি একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "দুঃখ ক'রো না সুনন্দা, সুখের চেয়ে তো স্বস্তি ভাল? মহানায়ককুলের উদগ্র ক্রোধ এড়াবার জন্যে উমাপতির পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় খুঁজে পাব?"

নিকটবর্তী একটা ঝোপে কি যেন একটা নড়িয়া উঠিতে দেখা গেল। সেইদিকে ফিরিয়া গৌরীপতি তীক্ষ্নস্বরে পর পর তিনটি শীষ দিতে বিস্মিতা সুনন্দা চাহিয়া দেখিল, সেই পরিত্যক্ত পল্লী এখন আর জনহীন নয়। কোথা হইতে নিঃশব্দ চরণে ছায়ার মত কতকগুলি প্রেতমূর্তি উঠিয়া আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সভয়ে গৌরীপতির আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিতে তাহাকে ভয় পাইতে নিষেধ করিয়া গৌরীপতি গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "সহদেব!" তাঁহার আহ্বানে একজন বলিষ্ঠ, ঘোরতর কৃষ্ণকায় ব্যক্তি অদূরবর্তী দল ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। গৌরীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার অতিথি আজ কেমন

আছেন?" উত্তরে সে ব্যক্তি কোন কথা বলিল না। কেবল মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গীর সঙ্গে হাতটা উল্‌টাইয়া বুঝাইয়া দিল, ভাল মন্দের কোন প্রশ্নই যে আর তাহার গৃহাগত হতভাগ্যটির বিষয়ে উঠিতে পারে না সে কথা সে নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছে। গৌরীপতি একবার চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?" সহদেব সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমার সঙ্গে আসুন।" কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া সে পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইল। একটি শক্তিমান্ বাহুর ভঙ্গীতে অনুচরদিগকে নির্দেশ করিয়া ততোধিক সংক্ষেপে বলিল, "আমাদের দলের লোক। তাহার পর পুনর্বার ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। গৌরীপতি ও সুনন্দা কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, বনচ্ছায়ার অন্তরালে সেই কৃষ্ণমূর্তিগুলি তাঁহাদের শিবিকার পার্শ্বে নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

ধ্বংসোন্মুখ একখানি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাগৃহের ততোধিক জরাজীর্ণ কপাট খুলিয়া সহদেব যখন তাহার সঙ্গীদিগকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল, তখন সেই মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে সুনন্দা প্রথমে কিছুই দেখিতে পায় নাই। অন্ধকারে চক্ষু কতকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে ধীরে ধীরে গৃহের অভ্যন্তরটি অস্পষ্ট মসীলিপ্ত চিত্রের ন্যায় তাহাব সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। কুটিরের এক প্রান্তে যে জীর্ণমূর্ত্তি, অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধ অবনত দেহে হাঁটুতে মাথা ঠেকাইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া সুনন্দা যেন বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল। এই কি তাহার মাতৃবর্ণিত "শাল-প্রাংশু, মহাভুজ ব্যূঢ়োরস্ক" উমাপতি—তাহার পিতা! কোথায় গেল তাঁহার সেই বজ্রতুল্য কবাটবক্ষ? সেই সুদীর্ঘ কদলীতরুসদৃশ গর্বোন্নত দেহ! শ্মশানোত্থিত, চিতানলদগ্ধ শবদেহেব ন্যায় বীভৎস, মনুষ্যত্বের সেই ভগ্নাবশেষের দিকে চাহিয়া মর্মন্তুদ বেদনায় সুনন্দার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন অসহায় ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে ঐ হতভাগ্য বন্দীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া অশ্রুজলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। ইচ্ছা হইল, একবার উচ্চকণ্ঠে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বৃদ্ধের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু বুকের ভিতরটা তাহার রুদ্ধ আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিলেও

তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, সেকথা সুরথ কোন দিন কল্পনাও করে নাই। জয়ন্তের মুখে এত কোমলতা, এত জ্যোতি, এত প্রশান্তিও সে আর কোন দিন দেখে নাই। একটি স্নিগ্ধ, মধুর হাসির আভা তাহার ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ভাসিতেছিল। অধরে একটি অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া সে সুরথকে কথা বলিতে বারণ করিল। তারপর তাহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রীতিউচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "প্রিয় সুরথ, আমি আজ তোমার পত্নীর নিকট হতে একটি অতি গোপনীয় সংবাদ বহন করে এনেছি। কিন্তু সে কথা শোনার আগে আমার কথামত কয়েকটি কাজ তোমাকে করে নিতে হবে। সময় আর একটুও নেই সুরথ! তোমার পরিধান ও অঙ্গচ্ছদ আমায় দাও, আমার বস্ত্র এবং উত্তরীয় তুমি গ্রহণ কর। তোমার হাতের অঙ্গুরীয় আমাকে দাও, আমার হস্তের এই অঙ্গুরীটি তুমি ধারণ কর। তোমার কর্ণে কুন্ডল আছে, না সুরথ? এখনই আমায় ওটি খুলে দাও তুমি! উত্তরীয়টি ঠিক আমার মত করে জড়িয়ে নাও ভাই। দেরী হলে সমস্ত পন্ড হয়ে যাবে—যা বলছি, এই মুহূর্তে তাই কর।"

নিম্নস্বরে অতি দ্রুত কথাগুলি বলিতে বলিতে জয়ন্ত ক্ষিপ্রহস্তে সুরথের সজ্জার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি করিয়া দিতেছিল। নিজের দেহে একটি আজানুলম্বিত অঙ্গচ্ছদমাত্র রাখিয়া আর সমস্তই সে খুলিয়া ফেলিল। তারপর দ্রুতহস্তে একটি একটি করিয়া সজ্জার বিভিন্ন অংশগুলি সুরথকে পরাইয়া দিতে লাগিল। তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় সুরথের সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! ভাই! তুমি এ কি করছ? কেন অনর্থক এ বৃথা চেষ্টা করতে এসেছ? বজ্রাসন কারাগার থেকে এ পর্যন্ত অনেক বন্দীই তো পলায়ন করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ-ই সফল হতে পেরেছে কি? আমার জন্য নিজের জীবন কেন তুমি বিপন্ন করতে এলে?"

সুরথের কেশের বন্ধন খুলিয়া উচ্ছৃংখলভাবে ললাটের উপর তাহা ছড়াইয়া দিতে দিতে জয়ন্ত উত্তর করিল, "আমি তোমাকে পলায়ন করতে সাহায্য করতে এসেছি,—একথা তো তোমায় বলিনি সুরথ? যদি বলি, তখন বরঞ্চ আমার কথার প্রতিবাদ কোরো। এখন তোমার পায়ে যে পাদুকা আছে, এ দুটি আগে খোল দেখি?"

সুরথের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার পাদুকা স্বহস্তে খুলিয়া লইয়া জয়ন্ত তাহার নিজের মখমলের উপরে জরীর কাজ করা পাদুকা সুরথকে পরাইয়া দিল।

—"জয়ন্ত! না, আমি পারব না! এ অনুরোধ আমাকে তুমি কোরো না। এতে শুধু আমার প্রাণ যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্বনাশ হবে। তুমি যাও জয়ন্ত, তুমি চলে যাও! অকারণে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে তোমাকে আমি দিতে পারি না—কেন এ অসম্ভব আশা মনে স্থান দিলে জয়ন্ত?"

সুরথের কম্পমান দেহ দুই হস্তে ধরিয়া জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি যদি তোমাকে কারাকক্ষের বাইরে একটি পদও বাড়াতে বলি, তখন না হয় তুমি কিছুতেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হোয়ো না। এখনও তো সে অনুরোধ আমি করিনি? তার চেয়ে যা বলছি, তাই কর। তোমার স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠি লিখে আমার হাতে দাও—আমি সেটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেব!...না, না, ও চিঠি নয়, আমি যা বলছি, নূতন করে তা-ই তুমি লেখো।"

সুরথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কম্পিত হস্তে লেখনী তুলিয়া লইল: জয়ন্ত তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার জীবনের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে এই চিঠি আমি লিখছি। তিন বৎসর পূর্বে উজ্জয়িনীতে একদিন তোমার সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছিল, সে কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। আজ যখন সমস্ত ঘটনা তুমি জানবে, তখন আমার সেদিনের কথাগুলি সবই তোমার মনে পড়বে সন্দেহ নেই। আজ পূর্ণ আনন্দে ও গৌরবে আমি মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছি। এ মৃত্যুতে আমার কোন দুঃখ, কোন ক্ষোভ, কোন অনুতাপ নেই, এই কথাটি তুমি সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস কোরো'...লিখেছ?" সুরথ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইতে না জানাইতে ঔষধের একটা তীব্র সুগন্ধে কারাকক্ষটি পূর্ণ হইয়া গেল। সুরথ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন জয়ন্ত ঔষধসিক্ত বস্ত্রখণ্ডটি সবলে তাহার মুখের উপরে চাপিয়া ধরিয়াছে। তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া সুরথ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।......ততক্ষণে জয়ন্ত ক্ষিপ্রহস্তে সুরথের পরিত্যক্ত সজ্জাগুলি পরিধান করিয়া লইয়াছে।

সুরথের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া জয়ন্ত মৃদু-স্বরে ডাকিল, "প্রহরি!" তাহার আহ্বান শুনিয়া বজ্রমুখ বিবর্ণমুখে, কম্পিতপদে কারাগৃহে প্রবেশ করিল। ভুলুণ্ঠিত দেহটির দিকে অকম্পিত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জয়ন্ত বলিল, "আমার বন্ধু এই জয়ন্তদেব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কিন্তু আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই আমার প্রাণদণ্ড হবে, এই দুঃসংবাদ সহ্য করতে না পেরে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। তুমি আর একজন প্রহরীকে ডেকে নিয়ে এসে এঁকে সঙ্গে করে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাও। আরও একটু কষ্ট তোমাকে আমার জন্য করতে হবে। ইনি যে শিবিকায় আরোহণ করে আমার কাছে এসেছিলেন, তার বাহকেরা সম্ভবতঃ এখনও দুর্গ-তোরণের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নিয়ে জয়ন্তদেবকে তাঁর গৃহে সামন্ত গৌরীপতির নিকটে তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসতে হবে। এই কাজটুকু করে দিলেই তোমার মুক্তি। তখন আর আমাকে ভয় করার মত কোন কারণ তোমার থাকবে না।"

বজ্রমুখ তখনও দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া জয়ন্ত তাহার দিকে একটা মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্নকণ্ঠে বলিল, "কি? আমার কথা বুঝতে পারছ না? না কাজটা খুবই বেশি শক্ত বলে বোধ হচ্ছে?"

বজ্রমুখ কম্পিত স্বরে বলিল, "আমাকে যতটুকু আপনি করতে বলছেন, তা বিশেষ কঠিন নয়। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, সূর্যাস্তের পরেও আপনি নিজে স্থির হয়ে থাকতে পারবেন কি না। তা যদি হয়—"

অসহিষ্ণুভাবে তাহার কথায় বাধা দিয়া জয়ন্ত ভূমিতে পদাঘাত করিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বজ্রমুখ! আমি যে তোমাকে এখন ডেকেছি, তা কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে অনর্থক তর্ক করে বহুমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করবার জন্য? আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে যা করতে বলেছি, তাই তুমি কর! আমার বন্ধুকে নিয়ে গৌরী-পতির কাছে দিয়ে আমার নাম করে বোলো, গতরাত্রিতে তাঁর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল, তা যেন তিনি স্মরণ রাখেন। অন্য কোন কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি যেন সকলকে নিয়ে যথা-সম্ভব দ্রুতবেগে নগরসীমা অতিক্রম করে উজ্জয়িনীর দিকে চলে যান। ব্যাস্! আর কথা বলে সব নষ্ট কোরো না। এবার যাও।"

জয়ন্তের দিকে একবার ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া বজ্রমুখ দ্বারের নিকটে গিয়া অপর একজন প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তারপর উভয়ে মিলিয়া সুরথদেবের অচেতন দেহ সযত্নে বহন করিয়া বাহিরে লইয়া গেল। জয়ন্ত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে চেষ্টা করিতেছিল, তোরণের নিকটে কোন আকস্মিক উত্তেজনা,—কোন দ্রুত পদশব্দ, কোন কঠোর কণ্ঠের আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে কি না। অর্ধদণ্ড কাল কাটিয়া গেল। দুর্গের অভ্যন্তরে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না। জয়ন্ত নীরবে তাহার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ঊর্ধাকাশে তুলিয়া ধরিল—বুদ্ধের কৃপায় তাহার সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে।

ক্রমে আরও প্রায় অর্ধপ্রহর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। জয়ন্ত গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিল, সন্ধ্যার আকাশ আরক্ত, উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে মুহূর্তটির জন্য সে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। বাহিরে দুর্গতোরণের সম্মুখে ভেরী বাজিয়া উঠিল, দুর্গের ভিতরে স্থানে স্থানে কারাকক্ষগুলির দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ দূর হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই সকল শব্দের অর্থ জয়ন্তের অবিদিত ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাহার চিত্তে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। অকূল নিরাশার সমুদ্রের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ সুরথকে ফিরিয়া পাইয়া সুনন্দার মুখে আনন্দ-উত্তেজনা কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তখন তন্ময় হৃদয়ে তাহাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার প্রশান্ত হৃদয়ের স্থির দৃষ্টি অরণ্য, কান্তার, পার্বত্যভূমির মধ্য দিয়া বায়ুবেগে ধাবমান একটি অশ্বশকটের গতি অনুসরণ করিয়া সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গরক্ষক যখন তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া তাহাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, তখন সে নীরবে, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল। বজ্রমুখ কারাগৃহের অতি নিকটে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু জয়ন্ত যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন কোন চিহ্ন তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

যমরাজের বাহনের মত ভয়ঙ্কর দুইটি মহিষ-বাহিত একখানি নাতিবৃহৎ উন্মুক্ত শকট দুর্গতোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। গত কয়েকমাসের মধ্যে বহুবার সৈনিকে পরিবেষ্টিত এই শকটটি দণ্ডিত হতভাগ্যদের লইয়া নগর হইতে শ্মশানে যাতায়াত করিয়া নাগরিকগণের

নিকটে যথেষ্ট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজও যখন চল্লিশটি মৃত্যোন্মুখ ব্যক্তিকে বহন করিয়া ধীর মন্থরগতিতে এই শকট চক্রের ঘর্ঘরে পাটলিপুত্রের রাজপথ কম্পিত করিতে করিতে চলিল, তখন নগরের প্রতি গৃহ হইতে শত শত উৎসুক দর্শক বাহির হইয়া আসিয়া চারিদিক পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ অভিশাপ দিল, কেহ বা নির্মম ঔদাসীন্যে বন্দীদের পরিচয় বিবৃত করিয়া নিকটস্থ প্রতিবেশীর কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে লাগিল। কিন্তু মৃত্যুপথ-যাত্রীদের শ্রান্ত, ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কেহ একবিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিল না—একটি সমবেদনা বা সান্ত্বনার বাণী কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইল না।

জনতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বজ্রমুখ শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। কি এক অসম্বরণীয় আকর্ষণ আজ তাহাকে কিছুতেই জয়ন্তের নিকট হইতে দূরে থাকিতে দেয় নাই। তাহার হৃদয়ে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা এক অভূতপূর্ব আবেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। জয়ন্তের মুখ হইতে সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছিল না। বিখ্যাত দেববংশীয় মহানায়ককুলের প্রতিনিধি আজ বধ্যভূমিতে চলিয়াছে, এ সংবাদ জনতার মধ্যে একটু বিশেষ চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছিল। শকট নগরের কেন্দ্রস্থলে গিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সুরথদেবের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস ও অভিশাপ বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। অন্যান্য দিন বজ্রমুখও ইহাতে সানন্দে যোগ দিত, কিন্তু আজ সে কিছুতেই এ দৃশ্য সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। জনারণ্যের মধ্য হইতে একজন অন্ত্যজ যুবক যখন তথাকথিত 'সুরথদেবের' প্রতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, তখন সে হাতে ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিল। ঈষৎ কোমল স্বরে বলিল, "আর কেন ভাই? আর একটুক্ষণ পরেই তো ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে, হতভাগ্যের সমস্ত পাপ মৃত্যুর মধ্যেই ধুয়ে মুছে যাবে। কেন আর ওর শেষমুহূর্তগুলি আরও যন্ত্রণায় ভরে তুলতে চাও?"

কিন্তু যাহাকে লইয়া জনতার এত উত্তেজনা, এত চাঞ্চল্য; তাহার দৃষ্টি বা কর্ণ কিছুই এদিকে ছিল না। শকটের এক প্রান্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঈষৎ ঊর্ধ্বমুখে সে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার প্রফুল্ল, জ্যোতির্মণ্ডিত মুখে অনির্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এমন সুন্দর দিন তাহার জীবনে আর কখনও আসে নাই! যে বৃক্ষকে শুধু কণ্টকে পরিপূর্ণ

মনে করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল, আজ তাহারই শেষ শাখায় অনুপম পুষ্পের বিকাশ দেখিয়া তাহার হৃদয় অনির্বচনীয় ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল। চতুর্দিকের সমস্ত দৃশ্য চক্ষু হইতে মুছিয়া গিয়া শুধু একটি পরম সুন্দর, স্নিগ্ধ মুখ—দুইটি করুণাবর্ষী শান্ত আঁখিতারা—তাহার চৈতন্য-জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ভাসিতেছিল। জনতার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস, ক্রমবর্ধমান, উত্তেজিত দামামা-ধ্বনি—সমস্ত শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া শুধু একটি সুমিষ্ট, স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর তাহার অন্তরাত্মা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতি রক্তবিন্দুর গতিতে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে সমস্ত চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া কেবল একটি নাম বাজিতেছিল—সুনন্দা! সুনন্দা! সুনন্দা!

বধ্যভূমি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। গোধূলির রাগ-রক্ত আলোকে সম্মুখের সু-উচ্চ বধমঞ্চ মহাকালের দণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিল। একে একে বন্দীগণ শকট হইতে অবতরণ করিয়া প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় মঞ্চের নিকটে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ঘাতকের হস্তে শাণিত খড়্গ সূর্য-রশ্মিতে জ্বলিয়া উঠিল—দ্রুততর দামামা-ধ্বনি দূরে নগরবাসীদিগকে জানাইয়া দিল, একজন দণ্ডিতের মুণ্ড দেহচ্যুত হইয়াছে।

দামামা বাজিতে লাগিল, একের পর এক বন্দীর ছিন্ন শির মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল—তখনও জয়ন্তের হৃদয় তাঁহার অন্তরের উৎসবে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। বহুদিন পূর্বে শ্রুত একটি বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনি তাহার হৃদয়ে বাজিতেছিল—"তমসো মা জ্যোতির্গময়!" মৃত্যু হইতে অমৃতলোকে আমাদের লইয়া যাও! ইহলোকে যে জীবন ব্যর্থতার অনলে দগ্ধ হইয়া অবশেষে ধূপের সুরভির মত একটি হৃদয়ের তৃপ্তির জন্য আপনাকে নিঃশেষিত করিয়া দিল, আলোকিত মহাপারাবারকূলে তাহাকে নবজন্ম দাও!

'হে বুদ্ধ, হে তথাগত, হে সুগত অমিতাভ, দীন-আত্মার উদ্ধার করিতে পূর্ণ কালে তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলে,—এই ব্যর্থ, অভিশপ্ত জীবনের উৎসর্গ তুমি গ্রহণ কর! তোমার অপূর্ব করুণা-স্নিগ্ধ নেত্রের ছায়া যাহার নয়নে প্রতিফলিত হইয়া এই জন্ম-উচ্ছৃংখলকে তোমার চরণ-প্রান্তে আকর্ষণ করিয়া আনিল, তাহার জীবন-পথ তুমি কল্যাণে মণ্ডিত করিয়া তোল!' জয়ন্তের নেত্র-প্রান্তে দুইটি উজ্জ্বল অশ্রু-বিন্দু ফুটিয়া

উৎসর্গ

— পিতৃদেবকে —

ভূমিকা

'মহানগরীর উপাখ্যান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এর ভালোমন্দ বিচারের ভার তাঁদের ওপরেই রয়ে গেল, যাঁদের জন্যে বইটি প্রথম লেখা হয়েছিল।

বইটি সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যা বলেছিলাম, পরিচিতি হিসেবে সেটুকুই আবার এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

" 'মহানগরীর উপাখ্যান' যে চার্লস ডিকেন্সের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'A Tale of Two Cities'-এর ছায়ানুসরণ তা বলাই বাহুল্য। সম্পূর্ণ বৈদেশিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসে মূল পরিকল্পনাটির অনুপম সৌন্দর্যের বাধা না হয়, সে জন্য দৃশ্যপট ও চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। প্রত্যেক দেশেই এই ধরনের সাহিত্যের একটা খুব বড় প্রয়োজন আছে। 'মহানগরীর উপাখ্যান' যদি সেই প্রয়োজনের সামান্যতম অংশ পূর্ণ করতেও সক্ষম হয়, তাহলে শ্রম সার্থক বোধ করব।

আর একটি কথা। যে স্বল্প-জ্ঞাত ঐতিহাসিক পটভূমিকা অবলম্বন করে ডিকেন্সের অমর কল্পনাকে এদেশীয় রূপ দিতে চেষ্টা করেছি, তার মধ্যে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্তবিদ্রোহই শুধু ইতিহাসানুমোদিত সত্য। 'মহানগরীর উপাখ্যান'-এর মধ্যে পাল সাম্রাজ্যের সামাজিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব যেন কেউ অনুসন্ধান না করেন। উপাখ্যান কল্পনাবিলাসীর জন্য— ইতিহাস সে নয়।"

লেখিকা

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

নন্দিকেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা তখন কেবলমাত্র বাজিয়া উঠিয়াছে। গোধূলির স্বর্ণালোকচ্ছটা পশ্চিম আকাশের প্রান্ত হইতে তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। ঘনায়মান রজনীর কৃষ্ণচ্ছায়ার অন্তরালে রক্তিম আলোকের রেখা একটি সূক্ষ্ম জরির পাড়ের মত ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। আকাশ কোমল নীল, মেঘচিহ্নহীন—উদীয়মান চন্দ্রের কিরণাভাসে স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর আজিকার সূর্যালোক একটি মধুমত্ত স্বর্ণকায় ভ্রমরের মত সমস্তদিন সকলের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। তাই নগরী আজ উৎসব-মুখর—রাজপথে লোকচলাচলের বিরাম নাই। প্রমোদ-উদ্যানে, প্রাসাদ-শিখরে, নন্দিকেশ্বরের মন্দিরদ্বারে, যেমন অজস্র ভূষণের সমারোহ, তেমনি অগণিত পুষ্পের সম্ভার। অধরে অধরে কৌতুকের হাসি, গতিভঙ্গিতে আনন্দ-চপলতা। উৎসব-প্রমত্ত বিশাল নগরী হাস্যে, লাস্যে, সম্পদচ্ছটায় জনপ্রিয় নর্তকীর মত টল্‌মল্‌ করিতেছে। আজ পাটলিপুত্রের দিকে চাহিয়া কে বলিবে, এই নগরে দুঃখের ছায়ামাত্রও বিদ্যমান আছে?

অবিরত প্রবহমান জনস্রোতের গতি এড়াইয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনন্দা অনভ্যস্ত ক্ষিপ্রপদে মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছিল। একটিও দাসী অথবা অনুচর সঙ্গে না লইয়া সে একাকী পথে বাহির হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে বৃদ্ধা ধাত্রী মঙ্গলা কখনই তাহাকে আসিতে দিত না। কিন্তু আজ প্রভাতে স্নানকক্ষের পরিচারিকার মুখে যে সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিয়াছিল, তাহা আর সুনন্দাকে কোন কথা চিন্তা করিবার অবসর দেয় নাই। যেমন করিয়াই হউক, নন্দিকেশ্বরের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইবার পূর্বে মন্দিরে তাহাকে একাকী উপস্থিত হইতেই হইবে। নিরুদ্ধ চিন্তাবেগে তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল থাকিয়া থাকিয়া আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, আবার পরমুহূর্তে অজানিত আশঙ্কায় রক্তহীন, বিবর্ণ হইয়া যাইতেছিল,

থাকিয়া থাকিয়া সে চারিদিকে চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া দেখিতেছিল, এই বিপুল জনতার মধ্যে পরিচিত কেহ তাহাকে চিনিতে পারিতেছে কি না। মন্দির তোরণের সম্মুখে পৌঁছিয়া সে পুনরায় সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বিশাল প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য——প্রবেশ পথের আশেপাশে দাঁড়াইবার সামান্য স্থানও নাই। সুনন্দা যখন দেখিল এই সহস্র সহস্র লোকের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি বিগ্রহের মুখে নিবদ্ধ, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার অথবা তাহাকে অনুসরণ করিবার অবসর কাহারও নাই, তখন সে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া সমীপবর্তী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিল। ঘন পত্রচ্ছায়ার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া একজন দীর্ঘকায় পুরুষ মণ্ডপের একপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুনন্দাকে লঘুপদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুক্তকরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সুনন্দা সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

চাহিয়া দেখিতে দেখিতে দীর্ঘকায় পুরুষের চোখের দৃষ্টি একবার ম্লান হইয়া পুনরায় উজ্জ্বল হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমিই সুনন্দা? উমাপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা?"

সুনন্দা মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। তাহার বাক্‌স্ফুট হইতেছিল না। আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরীপতি রাখিকে তোমার মনে পড়ে কি?"

এতক্ষণে সুনন্দা তাহার রুদ্ধ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মায়ের কাছে শুনেছি বাবার তিনি সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। আমার জন্মের এক বৎসর পরে সুবর্ণ দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়ে বাবা যখন সমুদ্রে ডুবে মারা যান, তখন তাম্রলিপ্তি থেকে মাকে ও আমাকে তিনিই পাটলিপুত্রে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তখন বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন। বাবার সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, শত্রুর হাত থেকে সেটুকু উদ্ধার করে তিনিই আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও মা তাঁর কথা বারবার বলে গিয়েছেন। আপনি তাঁকে চেনেন কি?" তাহার কথার শেষদিকে একটা আগ্রহের সুর ব্যক্ত

হইতে দেখিয়া আগন্তুকের মুখে একটি বিষাদ মিশ্রিত হাসি ফুটিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমিই গৌরীপতি।"

"আপনি!" সুনন্দা চমকিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। গৌরীপতি! দুর্দিনের বন্ধু, অনাথার আশ্রয় বলিয়া মাতা প্রতিদিন যাঁহাকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে ভাসিতেন! জ্ঞান সঞ্চার হইবার পর হইতে প্রতিদিন দেবতার নিকট যাঁহার কল্যাণকামনা করিবার শিক্ষা সুনন্দা তাঁহার নিকট পাইয়াছিল! সুনন্দার মনে পড়িল, কতদিন গভীর রাত্রে মায়ের বুকের কাছে শুইয়া সে তাম্রলিপ্ত হইতে তাহাদের পাটলিপুত্রে পলায়নের কাহিনী শুনিতে শুনিতে শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! কি দুরপনেয় বাধা লঙ্ঘন করিয়া কি কঠিন যাত্রা! কৃষ্ণ-পক্ষের তিমিরাচ্ছন্ন রজনী—পিচ্ছিল, কর্দমময় পথ—তদুপরি চারিদিক অধিকতর অন্ধকার করিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছিল। সেদিন প্রতিহিংসা-পরায়ণ অজ্ঞাতনামা শত্রুদলের হাত এড়াইয়া দ্রুত ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে এক বৎসরের শিশু সুনন্দাকে বক্ষে বাঁধিয়া সেই দীর্ঘ, দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন এই গৌরীপতি। তাহাব পর সুদীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। গৌরীপতির সংবাদ আর বালিকা সুনন্দা অথবা ভাগ্যহীনা রমাদেবীর নিকট পেঁাছায় নাই। হৃদয়ের আকুল ভক্তি ও বাল্যের সমস্ত কল্পনা একত্র করিয়া সুনন্দা দিনে দিনে সেই অদৃশ্য বন্ধুর মূর্তি গড়িয়াছে। মাতার মৃত্যুর পর চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে একমাত্র আত্মীয় ও আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকেই স্মরণ করিয়াছে। আজ সেই গৌরীপতি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! সেই গৌরীপতি তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন—"অদ্য রজনীতে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইবার পূর্বে একান্ত গোপনে নন্দিকেশ্বরের উদ্যানে একাকী উপস্থিত হইলে পিতার সংবাদ পাইবে!"

সুনন্দার আয়ত নয়নের কৃষ্ণতারকায় কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, ভয় ও বিস্ময় একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। পদ্মকলির মত দুটি হাত যুক্ত করিয়া ব্যগ্র-চরণে সে গৌরীপতির আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিল। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কেবল বলিল, "এতদিন কেমন করে আমাদের একা ফেলে এতদূরে ছিলেন?" তাহার অসহায় বালিকা-জীবনের সকল দুঃখ, শৈশবের একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধুকে সহসা ফিরিয়া পাইবার আনন্দের সঙ্গে একত্রিত হইয়া

রজতশুভ্র ধারায় তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে আজ এতদূর কল্পনা করিয়া আসে নাই। জ্ঞানোন্মেষাবধি সে পিতৃহীন। স্নেহময় পিতার কাহিনী মাতার মুখে শুনিয়া শুনিয়া এবং বাল্য-সখিগণের নিকট হইতে অপরিমেয় পিতৃস্নেহের বর্ণনা লাভ করিয়া তাহার বঞ্চিত, তৃষিত অন্তর পিতার এতটুকু স্মৃতির জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত। উমাপতির একটি হস্তাক্ষর অথবা অতিক্ষুদ্র প্রতিলিপিও তাহার নিকট ছিল না। তাই আজ বিশ্বস্ত দাসীর নিকটে পিতার সংবাদ লাভ করিবার সম্ভাবনার কথা জানিয়া সে ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। আশা ছিল, হয়তো বা পিতার শেষ দিনগুলির বিষয়ে কোন কথা এই আগন্তুকের নিকট জানিতে পারিবে। রমাদেবীর নিকটে সুনন্দা বহুবার শুনিয়াছে, উমাপতির সে একান্ত স্নেহের পুত্তলি ছিল। মৃত্যুকালে উমাপতি কি কন্যাকে স্মরণ করিয়া কোন আশীর্বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন? তাঁহার মৃত্যুক্লান্ত স্বর কি একমাত্র দুহিতার সম্বন্ধে কোনও শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল? বহু বিনিদ্র রজনীর শূন্য কল্পনার অবসান হয় তো বা আজ ঘটিতে পারে, সেই সম্ভাবনা সুনন্দাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া এই নির্জন সাক্ষাতের জন্য আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু কে জানিত মৃতের সংবাদ পাইতে আসিয়া বহুদিনের হারাইয়া যাওয়া পিতৃতুল্য বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিবে? সুনন্দার অকস্মাৎ মনে হইল, আর সে আশ্রয়হীনা নয়। গৌরীপতির পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনেও এক নবতর, উজ্জ্বলতর অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে।

গৌরীপতি সুনন্দার মাথার উপরে একটি স্নেহময় আশীষ-স্পর্শ রাখিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। চন্দ্র-কিরণ-স্নাত সুদূর গগনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার প্রশান্ত ললাটে চিন্তার কয়েকটি কৃষ্ণ রেখা দেখা দিল। কতকটা যেন আত্মগতভাবে তিনি বলিলেন, "সতেরো বৎসর হয়ে গিয়েছে, নয়? উমাপতির সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎও হয় সতেরো বৎসর আগে। উৎকল-বিদ্রোহে সেনানায়করূপে যাত্রা করবার পূর্বে তোমাদের বাড়িতে এসেছিলাম। উমাপতি তখন সুবর্ণদ্বীপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ফিরে এসে তাকে আর দেখতে পাইনি! তারপর সতেরো বৎসর হয়ে গিয়েছে?"

সুনন্দা রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাঁহার কথা শুনিতেছিল। ক্ষণকাল নীরবে

কি চিন্তা করিয়া গৌরীপতি পুনরায় তাহার দিকে ফিরিলেন। বলিলেন, "শোনো সুনন্দা, বিশেষ কোন কারণ বশতঃই যে এত দিন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি, সে কথা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ। আজ তোমাকে একটি অতি প্রয়োজনীয়, অথচ গোপনীয় সংবাদ দেবার জন্যেই সকল বাধা অতিক্রম ক'রে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু সে সব কথা বলবার আগে আমার কাছে একটি গল্প শোনো।"

"গল্প?" বিস্মিতা সুনন্দার রুদ্ধস্বর ফুটিতে না ফুটিতে মিলাইয়া গেল।

"হ্যাঁ, গল্প। তুমি ব্যস্ত হয়ো না সুনন্দা, শান্ত হয়ে সব কথা শুনে নাও। সে অনেক দিনের কথা—প্রায় সতেরো বৎসর আগে, তাম্রলিপ্তিতে একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী বাস করতেন"—

"সতেরো বৎসর!" সুনন্দার চমকিত কণ্ঠ কতকটা যেন সবিস্ময় প্রশ্নের মত শুনাইল। গৌরীপতি বলিলেন, "হ্যাঁ মা, সতেরো বৎসর। তোমাকে তো বলেছি সুনন্দা অধীর হয়ো না, মন দিয়ে সব কথা শুনে যাও। শ্রেষ্ঠীর নাম জেনে তোমার কোনও দরকার নেই। শুধু একটি কথা জানলেই যথেষ্ট হবে, তাঁর একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও এক বৎসরের একটি শিশুকন্যা ছিল"—

সুনন্দার কোমল হস্ত দুটি দৃঢ়মুষ্টিতে গৌরীপতির হাত চাপিয়া ধরিল। পরমস্নেহে সেই দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া গৌরীপতি বলিয়া চলিলেন, "সতেরো বৎসর আগে সেই শ্রেষ্ঠী এক দূরবর্তী দ্বীপে বাণিজ্য করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। একদিন সকালবেলা পরিবার পরিজনের নিকট হতে বিদায় নিয়ে তিনি বন্দরের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তারপর বহুদিন তাঁর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। ছয়মাস পরে শ্রেষ্ঠীর এক বিশ্বস্ত বন্ধু সংবাদ নিয়ে এলেন, সমুদ্রে ঝড় উঠে সব ক'খানা জাহাজ ডুবে গিয়েছে—যাত্রীদের মধ্যে অন্য সকলে কোনমতে প্রাণরক্ষা ক'রে দেশে ফিরে এসেছে কিন্তু শ্রেষ্ঠী ও তাঁর দুজন বিশ্বস্ত অনুচরের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

চকিতদৃষ্টিতে সুনন্দার প্রস্তরতুল্য নীরব মূর্তির দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৌরীপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এ পর্যন্ত গল্পটা তোমার জীবনের সঙ্গে অনেকটাই যে মিলে গিয়েছে, বোধ হয়

লক্ষ্য করেছ সুনন্দা। কিন্তু এর পর থেকে এ দুটি কাহিনীর মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। তোমার বাবা সত্যি সত্যি সমুদ্রে ডুবে মরা গিয়েছিলেন, না সুনন্দা? কিন্তু যদি তা না হতো, যদি তুমি হঠাৎ জানতে পেতে যে তাঁর মৃত্যুসংবাদ সর্বৈব মিথ্যা, তিনি আজও বেঁচে আছেন"—

"আর্যদেব!" সুনন্দার কম্পিত কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা রুদ্ধ চীৎকার বাহির হইয়া আসিল।

"শান্ত হও সুনন্দা ধৈর্য ধরো মা—বলছি, যদি উমাপতি সত্যিই আজ বেঁচে থাকতেন, এ সংবাদ তুমি পেতে, তাহলে তোমার জীবন-কাহিনীর সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠীকন্যার জীবনের ঘটনা সম্পূর্ণই মিলে যেতো। কারণ তার পিতার অন্তর্ধানের সতেরো বৎসর পরে এই সংবাদই সে তার এক পিতৃবন্ধুর নিকট পেয়েছিল। সুনন্দা! সুনন্দা!" অর্ধমূর্ছিতা সুনন্দার বেপমান দেহটি দুই স্নেহময় বাহুতে ধারণ করিয়া গৌরীপতি ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

ক্ষণকাল পরে সুনন্দা চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিল। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গৌরীপতির সম্মুখে নতজানু হইয়া মিনতিপূর্ণ ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "আর্যদেব! এ আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি একবার স্পষ্ট ক'রে আমাকে বলুন, এই শ্রেষ্ঠীর নাম কি উমাপতি? তাঁর মৃত্যুসংবাদ কি সত্যিই মিথ্যা?"

গৌরীপতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা হয়নি সুনন্দা, সত্যিই উমাপতি আজও বেঁচে আছেন। এই সংবাদই আজ আমি তোমাকে দিতে এসেছি।"

সুনন্দার গণ্ড বাহিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, ভগ্নকণ্ঠে সে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "আমার বাবা, আমাব বাবা বেঁচে আছেন! মৃত্যুর পরপার হতে আমার জন্যই তিনি আবার ফিরে এসেছেন!"

গৌরীপতি সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সব কথা না জেনেও তুমি ঠিকই বলেছ সুনন্দা। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ অতীতের হাত থেকে দেবতার দয়া তোমার কাছে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে বেশী কি আর বলব, উমাপতির জীবন, চৈতন্য —বুদ্ধি, এখন তোমার উপরেই নির্ভর করছে। নিজের দুঃখ দুর্ভাগ্যের

কথা ভুলে গিয়ে, পাষাণে বুক বেঁধে তুমি তার অতীত তাঁকে ভুলিয়ে দিতে পারবে না কি মা?”

অশ্রুম্লান চক্ষু দুটি গৌরীপতির মুখে নিবদ্ধ রাখিয়া সুনন্দা ভীতকণ্ঠে বলিল, “দেব, আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না! ভগবান নন্দিকেশ্বরের দয়ায় বাবাকে তো আমি ফিরে পেয়েছি, আপনি বলেছেন তিনি বেঁচে আছেন। তবে আবার পাষাণে বুক বাঁধবার কথা বলছেন কেন?”

গৌরীপতির দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অতি করুণ, অতি গভীর দুঃখময় একটি হাসি দেখা দিল। সুনন্দার চোখে চোখ রাখিয়া তিনি বলিলেন, “সুনন্দা, মৃত্যুই কি জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ? তার চেয়ে বড় দুঃখ যন্ত্রণা কি পৃথিবীতে কিছুই নেই!”

তাঁহার মর্মভেদী কণ্ঠস্বরে অজ্ঞাত আশঙ্কায় সুনন্দার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। গৌরীপতির দুই চক্ষে তখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকণা আসন্ন বাড়বানলের পূর্বাভাসরূপে দেখা দিয়াছে। আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া সুনন্দা শুনিল, দুঃসহ জ্বালাময় কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন, “সুনন্দা, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর নরক আর নরকের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, অনেক বেশি দুঃসহ শক্তিমান মানুষের হাতে গড়া তার দুর্বল প্রতিবেশীর ভাগ্য। নরকের কথা কি জান সুনন্দা! নরক তো তোমার কল্পনা! কিন্তু তার চেয়ে কত বেশি অত্যাচার যে মানুষ মানুষের হাতে প্রতিদিন ভোগ করছে, তার কথা কি তুমি কিছুই জানো না?”

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া গৌরীপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “জানো সুনন্দা, এই পাটলিপুত্র নগরে, সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে, কতগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত কারাগার আছে? সূর্যের আলো অথবা মুক্ত পৃথিবীর বাতাস সেখানে প্রবেশ করে না। কেবল সিক্ত মৃত্তিকার শৈবালাস্তরণ ভেদ ক’রে বিষাক্ত বায়ু শত শত দণ্ডিত হতভাগ্যের সন্তপ্ত নিঃশ্বাসে অধিকতর ক্লিষ্ট হয়ে বিদেহী আত্মার হাহাকারের মত ঘুরে বেড়ায়! সহস্রকোটি ক্লেদাক্ত কীট আর শত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আবর্জনা সেখানে বন্দীর একমাত্র সঙ্গী! প্রদীপের আলোকে মানুষের হাতে গড়া এই নরকের তমিস্রা দূর হয় না সুনন্দা, ঘনতর হয়—এমনই সে অন্ধকার। এই অন্ধকারে সে হতভাগ্য সামান্য অপরাধে—অথবা

বিনাপরাধে—বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, দিনে দিনে তার অবস্থা কি হয় একবার কল্পনা করতে পারো? দিনের পর দিন এই অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত যে দুর্গন্ধ, গলিত খাদ্য তাঁর জীবনধারণের একমাত্র উপায়, পথের কুকুরও সে খাদ্য দেখ্লে ঘৃণায় পরিত্যাগ করে। যে শতজীর্ণ বস্ত্রখণ্ড তার লজ্জানিবারণের একমাত্র সম্বল, পাটলিপুত্রে এমন ভিখারী নেই যে, সেই পরিধান দেখে উপহাসের হাসি না হাসে। স্বজন-সংস্পর্শ-হীন, আশাহীন, ন্যায়ের ছলনায় নিপীড়িত এই হত-ভাগ্যের দল যদি প্রথমে বুদ্ধি এবং অবশেষে জ্ঞান হারিয়ে ঘোর উন্মাদে পরিণত হয়, তবে সেটা কি খুব অস্বাভাবিক হয় সুনন্দা? মাটিতে কান পেতে যদি শুনতে পারতে তো দেখ্তে, এই মৃত্তিকার প্রতিটি কণা কত-শত হতভাগ্য বন্দীর অভিশাপে, দুর্বিষহ যন্ত্রণায় অহর্নিশি স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্ছে। মৃত্যুর সাহায্যে যে এর হাত এড়িয়ে গেল, সে তো বেঁচে গেল সুনন্দা! মৃত্যুকে কি তুমি এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বল্তে চাও?”

সুনন্দার রক্তহীন, বিবর্ণ ওষ্ঠাধর চন্দ্রের ক্ষীণালোকে শবের অধরের ন্যায় পাংশু দেখা যাইতেছিল। কম্পিত, ক্ষীণস্বরে সে বলিল, “দেব, এ সব কথা আমাকে কেন বল্ছেন, আমি ভালো ক'রে বুঝতে পারছি না। উমাপতি শ্রেষ্ঠীর নিষ্কলুষ জীবনের সঙ্গে এই সব কারাগারের কি সম্বন্ধ?”

“অতি নিকট সম্বন্ধ সুনন্দা! এ রাজ্যের একজন পরাক্রান্ত মহা-নায়কের চক্রান্তে নিরপরাধ উমাপতি এই দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ এই কারাগার-গুলির একটিতে অবরুদ্ধ ছিলেন। সাত বৎসর পরে সে সংবাদ আমার কর্ণগোচর হওয়ার পর গত দশ বৎসর অবধি তাঁকে মুক্ত করার জন্য দিনের পর দিন আমি বৃথা চেষ্টা ক'রে এসেছি। আজ এক সপ্তাহ হলো আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কিন্তু যে উমাপতিকে আমি চিন্তাম, তার ছায়াকেও আমি আর ফিরে পাইনি। প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের জয় হউক। অপ্রতিহত ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় সূক্ষ্ম নিয়মের ফলে পুরুষশ্রেষ্ঠ উমাপতি আজ ঘোর উন্মাদ। শ্মশানের প্রেতের সঙ্গও এখন তাঁর সান্নিধ্যের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য ও সহজ বলে গণ্য করা যেতে পারে।”

বাহিরে তাহার জিহ্বা মূক, চরণ গতিহীন হইয়া রহিল। কে জানে, অপরিচিতকে নিকটে দেখিলে এই জড়প্রকৃতি উন্মাদ কি করিয়া বসিবে!

হৃদয়াবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে সুনন্দা দেখিতে পাইল, গৌরীপতি বৃদ্ধের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বারম্বার আহ্বানে বৃদ্ধ যখন একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল, সুনন্দা দেখিল সে চোখ মৃত মৎস্য-চক্ষুর ন্যায় ভাবলেশহীন! বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ, জড়তুল্য প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইলেও তাহার কম্পিত অঙ্গুলিগুলি অনবরত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর তাহাদের অবিরাম স্পন্দনের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়া সুনন্দার বুকের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল। বহু অন্ধকার দিবস ও ততোধিক অন্ধকার রজনী নির্জন অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকিবার পরে কবে যে এই উপায়হীন হতভাগ্য মুক্তি-লাভে হতাশ হইয়া কেবল তাহার দুর্বল অঙ্গুলিগুলির সাহায্যে চারি-দিকের পাষাণ-প্রাচীরের প্রস্তরগুলি একটি একটি করিয়া খসাইয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিবার বৃথা চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল, কেহ জানে না। তাহার পর বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বন্দী তাহার এই শেষ আশা কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন কঠিন পাষাণের ঘর্ষণে তাহার হাত ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। নিষ্ফল সংগ্রামের মর্মান্তিক নৈরাশ্যে কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া হতভাগ্য তাহার যন্ত্রণাহত হৃদয়ের অশ্রু দিয়া কারাগৃহের সিক্ত মৃত্তিকা অধিকতর সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তখনও তাহার চৈতন্য তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। ক্রমে অনাহার, অনিদ্রা ও মানসিক যন্ত্রণা—সর্বোপরি অন্ধকূপের সেই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা—তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি ধীরে ধীরে হরণ করিয়া নিয়াছে। কিন্তু উন্মাদ অবস্থাতেও সে এই চেষ্টা একটি দিনের জন্যও ত্যাগ করে নাই। আজ তাই তাহার দেহের অন্যান্য অংশ নিস্পন্দ হইয়া গেলেও বহু বৎসরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার স্মৃতি ভুলিতে না পারিয়া তাহার অঙ্গুলিগুলি এখনও অনবরত কাঁপিয়া কাঁপিয়া কেবল সম্মুখের দুর্ভেদ্য প্রাচীর খসাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। ক্লেদাক্ত সরীসৃপের ন্যায় নিয়ত চঞ্চল, মৃত্যু-পাণ্ডুর তাহার অঙ্গুলিগুলির দিকে চাহিয়া যন্ত্রণার অশ্রুতে সুনন্দার দুই চোখ ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার বেদনাস্তম্ভিত হৃদয় কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইল না।

গৌরীপতি ডাকিলেন, "উমাপতি!" তাঁহার ঈষৎকম্পিত কণ্ঠ কর্ণে প্রবেশ করাতে বৃদ্ধ চমকিয়া পুনরায় মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু উমাপতি কে তাহা যে সে বুঝিয়াছে, এমন কোন চিহ্ন তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইল না। অর্থহীন দুটি চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষণকাল গৌরীপতির দিকে তুলিয়া ধরিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার মৃত্তিকার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। গৌরীপতি পুনর্বার ব্যাকুল আগ্রহ কণ্ঠে ভরিয়া সস্নেহে ডাকিলেন, "উমাপতি! উমা! আমাকে চিনতে পারছো না? আমি গৌরী, তোমাকে তোমার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"নিয়ে যেতে এসেছো?" বৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠে এইবার সাড়া ফুটিল। "কোথায় নিয়ে যাবে? বধ্যভূমিতে? তাই চল। চল..." তাহার দুর্বল স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে মিলাইয়া গেল। সে স্বরে তাহার শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ উপায়হীন বেদনায় যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে চাহিল। কত শ্রান্তি আর কত অবসাদ সে কণ্ঠে! মৃত্যুর জন্য কি সে নিরাসক্ত প্রতীক্ষা!

সুনন্দা আর সহিতে পারিল না। জলভরা চক্ষুদুটি গৌরীপতির দিকে তুলিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "আর্য, অনুমতি করুন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি!" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ধীরপদে সে বৃদ্ধের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানহীন উন্মাদ পাছে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, এই ভয়ে সহদেব ও গৌরীপতি দুইদিক হইতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন। হস্তের ইঙ্গিতে সুনন্দা তাঁহাদিগকে নিষেধ করিল। গৌরীপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি করুণাময়ী দেবীপ্রতিমার মত সুনন্দা ঈষৎ আনত হইয়া বৃদ্ধের দেহটিকে যেন আপনার স্নেহাঞ্চলে আবৃত করিয়া ধরিয়াছে। চক্ষে তাহার করুণার অশ্রু, অধরে সকরুণ হাসি, ললিত দুটি বাহুর আশ্রয়ে সে যেন হতভাগ্যের সকল দুঃখ নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে চায়। তাহার কোমল ললাটে দৃঢ়তার দীপ্তি, মধুর অধরে স্থির সংকল্পের রেখা—চাহিয়া চাহিয়া গৌরীপতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, এই আনন্দময়ী প্রতিমা যদি উমাপতির জীবনের অন্ধকার মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম না হয়, তবে আর কে তাহা পারিবে? বৃদ্ধের দৃষ্টি কন্যার দিকে আকৃষ্ট হইলে সে কি করে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ একভাবে কাটিয়া গেল। সুনন্দা সুকোমল স্নেহে ধূলিলুণ্ঠিত

জীর্ণমূর্তিটির প্রতি চাহিয়া আছে—দুয়ারের নিকট সহদেব ও গৌরীপতি প্রতীক্ষামান—মধ্যে মহাকালের তরঙ্গহীন অনন্ত সমুদ্র—এ প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নাই। অনেকক্ষণ পরে গৌরীপতির মনে হইল, বৃদ্ধ যেন কি একটা কথা ভাবিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার দুর্বল মস্তিষ্ক বিস্মিত হইতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই বিস্ময়ের রেখা তাহার মুখে দেখা দেয় নাই। কিন্তু সে যে বহুদিনের বিস্মৃত অতীত হইতে কোন একটা স্মৃতি মনের উপরে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে, সে কথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনিলেন, বৃদ্ধ আপনার মনে বলিতেছে, "না, না, তা কি ক'রে হবে? সে কি কখনও হয়? সে কেমন করে এখানে আসবে? কত দিন—কত দীর্ঘ বৎসর হয়ে গিয়েছে, সে কি আর এখনও তেমনটি আছে? কিন্তু এ কে? কে এ?"

বৃদ্ধের হতাশাময় করুণ-কণ্ঠ শুনিতে শুনিতে সুনন্দার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নতজানু হইয়া দুইটি কোমল বাহুতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া সে রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "বাবা! বাবা! আমি যে সুনন্দা—তোমার মেয়ে! সুনন্দার নাম তোমার মনে পড়ছে না?"

বৃদ্ধ অতি গভীর বিষাদে মৃদু মৃদু হাসিল। "সকলেই ঐ কথা বলে! এই অন্তহীন অন্ধকারে কত স্বপ্ন দেখি দিনের পর দিন—কত ছায়ামূর্তি আমায় ঘিরে দাঁড়ায়—বলে 'আমি নন্দা', 'আমি রমা!' হাত বাড়িয়ে তাদের ধরতে যাই—চীৎকার ক'রে ডাকি 'একবার—একটিবার তোমাদের দেখবো! একটু আমার কাছে এসে দাঁড়াও!' অমনি তারা অন্ধকারে আবার মিলিয়ে যায়। তুমিও তেমনি যাবে। এতদিন গিয়েছ, আজও যাবে। দুঃখ? কিসের দুঃখ? ..." বৃদ্ধ সহসা নীরব হইয়া গেল। স্মৃতির যে ক্ষীণ আলোকশিখা তাহার মনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যে দীপ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য তাহার চিন্তাসূত্রও হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া গৌরীপতির পাষাণনেত্র ভেদ করিয়া যন্ত্রণার অশ্রু বাহির হইয়া আসিল। হায়! জীবন্ত সমাধিতে ইহার যে স্মৃতি হারাইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া তাহা আবার ফিরিয়া আসিবে!

"বাবা, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার কথা শোনো! আমি স্বপ্ন নই বাবা, সত্যিই সুনন্দা. সত্যিই তোমার মেয়ে! করুণ কোমল স্পর্শ বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে বুলাইয়া, অশ্রুসিক্ত চক্ষু ও আগ্রহকম্পিত কণ্ঠস্বরের ব্যাকুল

নিবেদনের মধ্য দিয়া সুনন্দা যেন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দেহে চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। "নন্দিকেশ্বর আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমি কি বুঝতে পারছ, বাবা? এ অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করে তোমাকে নিয়ে আমি আজই কোন নির্জন পল্লীতে পালিয়ে যাব—সেখানে মহানায়কদের ক্রূর ক্রোধ, অথবা তাদের প্রভাবান্বিত রাজদণ্ডের ভীতি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না। সেখানে শুধু আমার কাছটিতে তুমি থাকবে বাবা, তোমার কাছে আমি থাকব। বাবা, আমি তো জানতাম না, তোমাকে আবার ফিরে পাব! মা স্বর্গে চলে' গিয়েছেন, একা একা অসহায় হয়ে কত কেঁদেছি। আজ তোমাকে পেয়ে মায়ের জন্য আবার আমার আকুল হয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। মা যে তোমার জন্য এই সতেরো বৎসর কত কেঁদে গিয়েছেন! তোমার কথা মা সবই জানতেন, কিন্তু পাছে সে কথা আমি জানলে দুঃখের ভারে আমার মন ভেঙ্গে পড়ে, এজন্য আমাকে বুঝিয়েছিলেন, তুমি সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছ! কিন্তু আমি তো জানি দেবতার দুয়ারে তোমার জন্য কত প্রার্থনা তিনি করেছেন, আমাকে তোমার মনের মত করে গড়ে' তুলতে তাঁর কি অসীম আগ্রহ ছিল! আজ তুমি ফিরে এলে বাবা, কিন্তু মা আজ কোথায়!"

"রমা!" একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার যন্ত্রণাহত মুখের দিকে চাহিয়া গৌরীপতি বলিয়া উঠিলেন, "জয় নন্দিকেশ্বর!" অশ্রুভরা দুটি চক্ষু তাঁহার দিকে তুলিয়া সুনন্দা বলিল, "আর্য, আজ এখনই, এই মুহূর্তেই ওঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় না? আজ রাত্রেই বাবাকে নিয়ে আমি পাটলিপুত্র ছেড়ে যেতে চাই। এই দুর্বিষহ স্মৃতিজড়িত নগরে আর একটি দিনও তাঁকে আমি রাখব না। আপনার শিবিকাতে কি এঁকে এখন নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?"

এই দীর্ঘকাল সহদেব প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। এতক্ষণে যেন তাহার মধ্যে জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। সুনন্দার ক্রোড়ে ন্যস্ত উমাপতির শবতুল্য পাণ্ডুর দেহের প্রতি একটি অকম্পিত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠী উমাপতির পক্ষে পাটলিপুত্র একটি দিনের জন্যেও নিরাপদ নয়। শ্রেষ্ঠীকন্যার পক্ষেও এ নগরী অবিলম্বে ত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত।" তাহার ললাটের ভীম ভ্রূকুটি, কৃষ্ণচক্ষুর দাহকারী দৃষ্টি মিলিয়া তাহাকে যেন ন্যায়দণ্ডধারী মহাকালের

মত ভীষণ করিয়া তুলিয়াছিল। গৌরীপতি শিবিকা আনয়নের জন্য বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে সে হস্তের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। বলিল, "আমার অনুচরেরা আপনাদের শিবিকা নিয়ে এসে বাইরে প্রতীক্ষা করছে। শ্রেষ্ঠীকে বহন ক'রে নিয়ে যেতে আমি আপনাকে সাহায্য করব। আর কাউকে ডাকবার প্রয়োজন হবে না।" অচেতন উমাপতির দেহ সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া দুইজনে বাহিরে আসিলেন। ক্ষিপ্রগতি বাহকেরা দেখিতে দেখিতে শিবিকা লইয়া সেই ভয়ংকর স্থান পশ্চাতে ফেলিয়া বৃক্ষচ্ছায়ার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুনন্দা যদি তখন ফিরিয়া চাহিত, তবে দেখিত, করালমূর্তি সহদেব তখনও সেই কুটিরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এক চোখে তখনও প্রতিহিংসার আগুন, কিন্তু অপর চক্ষুতে ততোধিক জ্বালাময় বেদনার অশ্রুরেখা!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পর্বত-সানু অবন্তীপ্রদেশ! বসন্তের রঙিন হাস্যে সমুজ্জ্বল প্রকৃতির চির-আনন্দ নিকেতন! সতত-সঞ্চরমান মেঘকুলের ছায়ায় শীতল, উজ্জ্বল সূর্যালোক-রঞ্জিত এই রমণীয় স্থান উত্তরাখণ্ডে কাহার না মনোহরণ করিয়াছে? পঞ্চশত বৎসর পূর্বে কালিদাস যে মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্য দিয়া এই জনস্থানের প্রতিটি ক্ষুদ্র কুসুমকে পর্যন্ত গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে আজও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। এখনও উজ্জয়িনীর আকাশে মেঘ দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যায়—জনপদবাসিনী 'চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা' কোন্ পথিকবধূর হৃদয় দূরদূরান্তরে আকর্ষণ করিয়া যায়। উজ্জ্বল স্ফটিকনির্মিত প্রাচীর-গাত্রে বহুবর্ণের পুষ্পমাল্য আজও তেমনি দোলে। স্নিগ্ধ মেঘালোকে সু-উচ্চ প্রাসাদের শিখরদেশ দূরে আকাশের গায়ে মিলাইয়া গিয়া পথিকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করে। গন্ধবতী-তীরে বহু প্রাচীন মহাকালমন্দিরের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, স্বচ্ছতোয়া শিপ্রার কূলে রম্য সৌধমালা—মহিমান্বিত গৌরবে আজও বিরাজমান। কালের ঘূর্ণমান চক্রের আবর্তে কালিদাসের

যুগের পর চারিদিকে কত সাম্রাজ্য ভাঙিয়াছে, গড়িয়াছে, কিন্তু মহাকালের পূজাপীঠ বলিয়াই বোধ হয় সে পরিবর্তন সুবিশালা উজ্জয়িনীকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। আজও উজ্জয়িনী পথিকজনের আনন্দ, বিলাসীর সুখময় আশ্রয়—ভাববিলাসীর চিরকাম্য স্বর্গপুর! শত শত অমরাবতী-তুল্য নগরে পরিপূর্ণ উত্তরাপথের সর্বশ্রেষ্ঠ গর্ব ও কামনার ধন। ক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলাইতে উজ্জয়িনীর মত কোন্ স্থান?

সপ্তদশ বৎসরের কারাবাসের স্মৃতি ভুলাইয়া দিবার জন্য সুনন্দা অর্ধোন্মাদ পিতাকে লইয়া উজ্জয়িনীতে আসিয়াছিল। বুদ্ধিতে ও বলে পঙ্গু উমাপতির দিকে চাহিয়া কতবার তাহার চিত্ত হতাশায় ভরিয়া গিয়াছে, মনে হইয়াছে, এই ব্যাধিগ্রস্ত অবসন্ন দেহে চেতনা বুঝি আর কোন দিনই ফিরিয়া আসিবে না। অক্লান্ত শুশ্রূষা ও অপরিসীম স্নেহ দিয়া উমাপতির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে ভরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তবুও প্রথম তিনটি বৎসর তাহার অবিশ্রান্ত চেষ্টাও হতভাগ্য বন্দীকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারে নাই। কতদিন সুনন্দার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মত কথা বলিতে বলিতে সহসা উমাপতির ভাবান্তর হইয়াছে, উজ্জয়িনী—সুনন্দা—গৌরীপতি—কিছুই আর তাঁহার মনে থাকে নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সুনন্দার মনে হইত, তিনি যেনু তাঁহার সেই দুঃসহ যন্ত্রণাময় অন্ধকার নির্জনতায় পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রশান্ত মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া যাইত, অকাল-বার্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিত। তখন কখনও বা তিনি জড়ের মত হতবুদ্ধি হইয়া গৃহের এককোণে পড়িয়া থাকিতেন, কখনও বা আর্তকণ্ঠে মুক্তি ভিক্ষা করিয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন। কতরাত্রে সযত্নে পিতাকে তাঁহার শয্যায় ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিবার পরে গভীর রাত্রে কিসের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সুনন্দা নিঃশব্দপদে তাঁহার গৃহের নিকটে গিয়া দেখিয়াছে উমাপতি অস্থিরভাবে কক্ষতলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার চারিদিকে কি যেন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—কোন্ পাষাণপ্রাচীরের করাল ছায়া তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। রুদ্ধ-গতি উমাপতি নিদারুণ হতাশায় কম্পিত অঙ্গুলির সাহায্যে কেবল অনবরত সেই বাধা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন! একটি একটি করিয়া পাথর খসাইয়া উন্মুক্ত জীবন ও সূর্যালোকের দিকে পথ বাহির

করিয়া লইবার জন্য সে কি আশাহীন নিদারুণ সংগ্রাম! এই দৃশ্যটিকে সুনন্দা সকলের চেয়ে বেশি ভয় করিত, তাহার মনে হইত, ঐ চঞ্চল অঙ্গুলিগুলির বিরামহীন গতি সে যেন আর কিছুতেই—কোনদিন নিরস্ত করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাহার সকল চেষ্টা. সকল যত্ন উপেক্ষা করিয়া, সকল দিবারাত্র ভরিয়া তাহারা অন্ধ পতঙ্গের মত চিরকাল—চিরযুগ—কেবল অদৃশ্য প্রাচীরের গায়ে মাথা ঠুকিয়াই ফিরিবে! চাহিয়া চাহিয়া সুনন্দার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত, মনে হইত, উমাপতির কম্পমান অঙ্গুলিগুলি তাহার চারিদিকেও এক দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছে। তাহার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন যেন সেই প্রাচীরের ছায়ায় অন্ধকার। উমাপতির যেমন. সুনন্দারও তেমনি, এই ক্ষমাহীন পাষাণের বন্ধন হইতে কোনদিন মুক্তি নাই! দিনের বেলা তবু গৌরীপতি মাঝে মাঝে কাছে আসিয়া বসিতেন, মঙ্গলা কখনও বকিয়া ঝকিয়া কখনও বা তাহার স্বভাবকঠিন হৃদয়ের একমাত্র স্নেহের পাত্রীটির প্রতি সমগ্র স্নেহভালবাসার অত্যাচার নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়া সুনন্দার মনে কতকটা জীবনীশক্তি আনিয়া দিত। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে দিনের পর দিন এই ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় তাহাকে যেন পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিত। তবুও সুনন্দা তাহার হৃদয়কে ভাঙিয়া পড়িতে দেয় নাই। এই সকল সময়ে নীরবে যুক্তকরে দেবতার নিকটে বল প্রার্থনা করিয়া সে লঘুপদে উমাপতির নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া একটি কোমল বাহুতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিত। লক্ষ্যহারা উমাপতি অন্ধভাবে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সুনন্দা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। তাঁহার সর্বাঙ্গে স্নেহকোমল হাত বুলাইয়া দিত, কস্তুরীসুবাসিত শীতল জলে উমাপতির ললাট সিক্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে ডাকিত, "বাবা!" কয়েকবার আহ্বানের পর উমাপতির সহসা চট্‌কা ভাঙিয়া যাইত, যেন গভীর যন্ত্রণাময় নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সজোরে একটি ক্লিষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাড়া দিতেন, "মা!" "রাত যে অনেক হয়ে গেছে বাবা, শুতে যাবে না?" কন্যার রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া উমাপতি শ্রান্ত কণ্ঠে বলিতেন, "চলো মা, যাই।" সুনন্দার হাতখানি সজোরে চাপিয়া ধরিয়া তিনি ঘরে ফিরিতেন, মনে হইত সমগ্র বিশ্বে তিনি বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ! এমন করিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, ঘোরতর উন্মাদ অবস্থাতেও তাহার

কণ্ঠস্বর এমন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে চেষ্টা করিতেন, যে মনে হইত, অতলস্পর্শ অন্ধকার সমুদ্র হইতে শব্দস্পর্শজ্ঞানময়ী পৃথিবীর জগতে ফিরিয়া আসিতে তিনি যে কঠিন চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাতে ঐ একখানি তরুণ মুখ তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

সে মুখে উমাপতি কখনও হাসি ও প্রশান্তি ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। তাঁহার এই নিদারুণ অবস্থায় সুনন্দার মনে যাহাই হউক না কেন, পিতার নিকট উপস্থিত হইতে তাহার মধুর অধরে একটি মধুরতর হাসি সর্বদা লাগিয়া থাকিত। তাহার গভীর কালো চোখের তারায় যে স্থির গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠিত, উমাপতির বিকল হৃদয় তাহাতে শান্তি ও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইত। সুনন্দার লাবণ্যময়ী মূর্তি এই অভিশপ্ত বৃদ্ধের ক্লান্ত চক্ষুতে অমৃত সিঞ্চন করিত। তাহার অকৃত্রিম গভীর স্নেহ ধীরে ধীরে তাঁহার দেহে জীবন সঞ্চার করিতেছিল। যে উন্মাদ অবস্থা একদিন তাঁহার নিত্য সহচর ছিল, ক্রমে তাহা বহু দিনের ব্যবধানে উৎকট রোগের পুনরাক্রমণের মত দেখা দিতে দিতে অবশেষে তাঁহার দেহ হইতে একেবারে মিলাইয়া গেল। সুনন্দার একাগ্র ব্রতের পুরস্কার মিলিল।

প্রথম সন্তানবতী জননীর মত সুনন্দা তাহার পিতার সুখসুবিধার জন্য যে সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল, ধীরে ধীরে উমাপতি সেগুলি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাটলিপুত্র বা তাম্রলিপ্তিতে যে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় তাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহাদের উজ্জয়িনীর বাসগৃহ তাহার চেয়ে অনেক হীন ছিল। কিন্তু সুনন্দার কল্যাণমণ্ডিত নিপুণ হস্তের গুণে সেই সামান্য গৃহখানি উমাপতির পক্ষে স্বর্গের চেয়েও সুখকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুনন্দা বহুযত্নে বহুদিন ধরিয়া নানা বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধ-সম্পদে সমৃদ্ধ পুষ্পের রাশি দিয়া বাগান ভরিয়া রাখিয়াছিল—যদি উমাপতির সজ্ঞান মুহূর্তে সে ফুলের শোভায় সৌরভে তাঁহার মন কিছুমাত্র আনন্দ খুঁজিয়া পায়, যদি তাঁহার ক্লান্ত মস্তিষ্কে ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এতটুকুও সাহায্য করে! জ্ঞানলাভের পর হইতে সেই উদ্যান উমাপতির সকলের চেয়ে প্রিয় স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনি এই উদ্যানে একটি পুষ্পিত অশোক অথবা কোবিদার বৃক্ষের ছায়ায় একখানি সুখাসনে

দেহ এলাইয়া কাটাইয়া দিতে ভালবাসেন। সুনন্দা অধিকাংশ সময় গৃহ-কর্মে ব্যাপৃতা থাকে, অবসর পাইলেই হাসিমুখে পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের প্রান্তদেশে পাখীর ক্ষীণ কূজন শোনা যায়, তপ্তবায়ুর স্পর্শ পাইয়া শিথিলবৃন্ত পুষ্পগুলি ঝরিয়া পড়িয়া পিতাপুত্রীর জন্য কোমল আসন রচনা করিয়া দেয়। সেই অলস মধ্যাহ্নে উমাপতির চরণপ্রান্তে বসিয়া সুনন্দা তাঁহাকে মহাকাব্য, গীতিকাব্য পাঠ করিয়া শুনায়। আবার যখন শিপ্রার জল কালো করিয়া সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসে, অন্ধকার আকাশে স্তব্ধ রাত্রির নিঃসঙ্গতা দূর করিয়া নক্ষত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তখন উমাপতি ও গৌরীপতি বকুলবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া নিমীলিত নেত্রে সুনন্দার মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত উপভোগ করেন। উমাপতির চৈতন্যময় জীবনের পুনরারম্ভের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি সুনন্দার এই সঙ্গীত। উজ্জয়িনীতে আসার পর প্রথম বৎসর যখন দিবা-রাত্রি তাঁহার বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়া যাইত, তখন সেই উন্মত্ত অবস্থাতে মাঝে মাঝে একটু চেতনা ফিরিয়া আসিলে অনেক সময়েই তিনি শুনিতেন, সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে গান গাহিয়া তাঁহার বিকল স্নায়ুগুলিকে শান্ত করিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। সেই মৃদুমধুর গুঞ্জনের স্মৃতি তাঁহার কন্যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আজও তাই সুনন্দার গান শুনিতে শুনিতে উমাপতি আপনার আশাহীন জীবনে তাহাকে প্রথম পাওয়ার অনুভূতির আনন্দে ডুবিয়া যান। স্নেহশীলা কন্যার কোমলমধুর অন্তঃকরণের প্রগাঢ় প্রীতির নিদর্শনটুকু সমস্ত চিত্ত দিয়া তিনি এই সময় উপভোগ করিতে থাকেন। তাই সুনন্দার সঙ্গীত ছাড়া তাঁহার একটি সন্ধ্যাও কাটিতে চায় না।

সেদিনও এমনি গানের পর গান গাহিয়া সুনন্দা কেবলমাত্র স্তব্ধ হইয়াছে। তাহার অনিন্দ্য-কণ্ঠসৃষ্ট সুরজালের রেশ গাছের পাতায়, আকাশের গায়ে তখনও যেন লাগিয়া রহিয়াছে। বাতাস ভীরুপদক্ষেপে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার মাথার উপরে শাখাপ্রশাখাগুলি দোলাইয়া দিয়া যাইতেছিল, সেই লঘু স্পর্শে ছোট ছোট পাতাগুলি সুখে, লজ্জায় থাকিয়া থাকিয়া শিহরিতেছিল। দূরে আলোকোদ্ভাসিত উজ্জয়িনীর রাজপথের দিকে চাহিয়া গৌরীপতি বলিলেন, "আজ নগরে কিছু একটা উৎসব আছে, দেখছো সুনন্দা? আলোয় আলোয় চারিদিক যেন ছেয়ে

গেছে। এই অন্ধকারে বসে ওদিকটাকে আরও বেশি উজ্জ্বল লাগছে, না মা?"

অর্ধশয়ান অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিয়া উমাপতি বলিলেন, "কোন্‌টা ভালো গৌরী, আলো না এই অন্ধকার?"

পিতার কথার সুরে তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া সুনন্দা একটু হাসিয়া তাঁহার আরও নিকটে সরিয়া বসিল। গৌরীপতি হাসিয়া বলিলেন, "অন্ধকারে বসে যদি সুনন্দা মায়ের গান শুনতে পাওয়া যায়, তাহলে ঐ লোকজনের ভীড়ের চেয়ে অন্ধকার তো বেশি ভালো লাগবেই! কিন্তু গান তো আজ অনেক শুনেছো, একবার উৎসবটা দেখতে একটু বাইরে যাবে না?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া উমাপতি বলিলেন, "না, না, বাইরে নয়। যতক্ষণ পারি আমার মায়ের কাছটিতে আমায় থাকতে দাও। সারাদিন তো মা আমার ছেলেকে ফেলে হাজারটা কাজে ব্যস্ত হয়েই থাকে—এখন এই সময়টুকুতেও আবার আমাকে তার কাছ থেকে টেনে নিয়ে যেতে চাও?" তাঁহার কথাগুলি রহস্যের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইলেও শেষের দিকটায় কেমন যেন একটা অতীত দুঃখের স্মৃতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুনন্দা সস্নেহে তাঁহার মাথাটি কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "কেন বাবা, তুমি তো সারাদিন আমার কাছেই রয়েছ?" উমাপতি নিমীলিত চক্ষে মাথার উপরে কন্যার হাতের স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন, তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্নেহজড়িত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে পিতাপুত্রীর দিকে চাহিয়া গৌরীপতি হাসিমুখে বলিলেন, "তুমি দেখছি তোমার বাবাকে একেবারেই ছোট ছেলে করে তুলবে সুনন্দা! কিন্তু বল দেখি, একেবারে বহির্জগতের সঙ্গে না মিশে এমন ভাবে ঘরে বসে থাকা কি ভালো?"

অনেকগুলি কিশোর কিশোরী, বালক বালিকা নানাবর্ণের বেশভূষায় সাজিয়া দল বাঁধিয়া সম্মুখের পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া গৌরীপতি বলিলেন, "এই যে দিনের পর দিন তোমাদেরই ঘরের পাশের পথটি দিয়ে কত শত শত লোক আসছে, যাচ্ছে, তাদের চিনতে, বা তাদের সুখদুঃখের কথা জানতে তোমাদের কি একটুও ইচ্ছা করে না? মানুষের সমষ্টি নিয়েই সমাজ, যদি অন্য সব্বাইকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেদের নিয়ে নিজেরা থাকতে চাও,



তবে তো সামাজিক জীবনটা একেবারেই বাদ দিয়ে দিতে হয়!"

উমাপতি একটু শ্লেষের সুরে বলিলেন, "মানুষের সমাজ কোথায় দেখছো গৌরী? পশুর সমাজ বলো। চারিদিকে যত পাশবিকতার কাহিনী দেখতে পাও, মানুষ হলে কি মানুষের পক্ষে এমন ব্যবহার করা একটি দিনের জন্যও সম্ভব হতো? আমার কথা যদি বলো, তো বাকী জীবনটা আমি তোমাদের এই সমাজের বাইরেই কাটিয়ে দিয়ে যেতে চাই। ঐ যে দেখছ উজ্জ্বল রাজপথে উত্তাল জনসমুদ্র, দূর থেকে দেখছ তাদের বেশভূষার ঔজ্জ্বল্য, মণিমাণিক্যের দীপ্তি—উচ্ছ্বসিত হাঁসি, কথা, গান। কাছে গিয়ে দেখ যদি, দেখবে কী স্বার্থ আর কুটিলতা, কত দ্বন্দ্ব আর সংঘাত সমুদ্রের ফেনোচ্ছাসিত তরঙ্গের নীচে করাল মকর কুম্ভীরের মত ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। কেন আমাকে আবার ওদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চাও? এই সমাজের যা পরিচয় আমি পেয়ে গিয়েছি, মানুষের একটি জীবনের স্বল্পকয়টি দিনের জন্য তাইতো যথেষ্ট—আর কত?"

গৌরীপতি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "সংসারের সকলকেই ওরকম এক শ্রেণীভুক্ত করে দেখা ভুল উমা, এ সংসারে গরল যেমন আছে, যাঁরা গরল পান ক'রে অপরকে সে হলাহলের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এমন নীলকণ্ঠই কি আর নেই?"

সুনন্দা নীরবে উভয়ের কথা শুনিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে বলিল —"জানো বাবা, আমার মনে হয়, মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, আমরা চাই বা না চাই, এই বিস্তীর্ণ জনপ্রবাহের প্রভাব আমাদের জীবনে অনেকখানিই এসে পড়বে। ভালোমন্দ, শুভাশুভ বেছে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। নিয়তির খরস্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত আমরা অসহায় অনির্দিষ্ট ভাবে ছুটে চলেছি। জনসমাজ থেকে যত দূরেই সরে থাকতে চাই না কেন, স্রোতের টানে সে চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েই যাবে। সমুদ্রের তীরে ঘর বেঁধে তরঙ্গের আঘাত থেকে কে কবে পরিত্রাণ পেতে পারে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "তোমরা শুনে হয় তো হাসবে, কিন্তু অনেক সময় আমার মনে এক অদ্ভুত কল্পনা জেগে ওঠে। গভীর রাত্রে যখন চারিদিকের অন্যান্য শব্দ থেমে যায়, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে শুনি—তখনও রাজপথে থেকে থেকে কত লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কখনও লঘু পায়ের মৃদু শব্দ, কখনও দৃপ্ত

পদের গম্ভীর প্রতিধ্বনি—মনে হয় অনাদি অনন্তকাল ধরে 'এই পায়ের শব্দ দূর দূরান্তর থেকে কেবল ভেসে আসছে—এর যেন আর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। তখন আমার কেমন একটা ভয় হতে থাকে, মনে হয়, যেন এই পদশব্দগুলির গতিবেগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে—আমি যেন দেখতে পাই, ক্রমে সেই জনতার স্রোতে দূর দূরান্তর থেকে আরও শত শত লোকি এসে যোগ দিচ্ছে, আর সেই উন্মত্ত জনসঙ্ঘ যেন ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফুঁস্‌তে ফুঁস্‌তে আমাদের দিকে ক্রমাগত ছুটে আসছে। কেন এমন হয়, বাবা?"

গৌরীপতির দেহ এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। রুগ্ন পিতার শুশ্রূষায় অবিরত নিযুক্ত থাকার ফলে সুনন্দার শরীর মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়া যায় নাই তো? উমাপতি কি বলিতে যাইতেছিলেন, ব্যাগ্রকণ্ঠে তাঁহাকে বাধা দিয়া গৌরীপতি বলিয়া উঠিলেন, "ও কিছু নয় সুনন্দা, শুধুই তোমার মনের কল্পনা। তোমার ওপরে মানুষের রাগ কি করে' হবে আমি তো ভেবে পাইনে—তুমি কি কারুর অনিষ্ট করতে পারো? যাক—ওসব কথা যাক—কি বলতে গিয়ে কি কথা এসে পড়লো। তুমি আর একবার বীণাটি ধরো তো মা! তোমার বাবা যখন আজ আর কোথাও বেরুবেনই না, তখন তোমার আর একখানা গানই শোনা যাক।"

মৃদু হাসিয়া সুনন্দা বীণাটি কোলে তুলিয়া লইল। আর একবার তাহার শিক্ষিত হস্তের মৃদু রণনে, উদ্যানের নিস্তব্ধতা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সুনন্দার কণ্ঠে ছায়ানটের এই বিচিত্র রূপটির সমাপ্তির রস উপভোগ করা উমাপতি বা গৌরীপতির ভাগ্যে ছিল না। বীণার যন্ত্রে ও সুনন্দার কণ্ঠে যখন সুরের মায়া কেবলমাত্র অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তখন উদ্যানের প্রবেশপথের নিকটে কয়েকজন লোকের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। পরক্ষণে উমাপতির ভৃত্যকে একপাশে সরাইয়া দিয়া কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী উদ্যানের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বীণা রাখিয়া সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল। গৌরীপতি আসনত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে সৈনিকগণের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কাকে চাও?" নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া প্রথম সৈনিক সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উত্তর করিল, "আপনি কি মহাশ্রেষ্ঠী উমাপতি? এ রাজ্যের মহাপ্রতীহার বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ও শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনন্দাদেবীকে স্মরণ করেছেন। আমাদের সঙ্গে এখনই একবার

পূর্বতোরণে তাঁর মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হলে তিনি অতিশয় সুখী হবেন। শিবিকা প্রস্তুত; আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে চলুন।"

উমাপতি পশ্চাৎ হইতে সকল কথাই শুনিতেছিলেন। দৃঢ়হস্তে বন্ধুকে একপাশে সরাইয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিই উমাপতিশ্রেষ্ঠী, ইনি আমার সুহৃদ গৌরীপতি। কিন্তু মহাপ্রতীহার আমাকে ও আমার কন্যাকে সহসা কেন মন্ত্রণাগৃহে আহ্বান করেছেন, তা তো বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু বলতে পারো?"

সৈনিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠি, আপনি যখন তিন বৎসর পূর্বে উজ্জয়িনীতে প্রথম এসেছিলেন, তখন সুরথদেব নামে এক গৌড়ীয় যুবক কি আপনার সঙ্গী হয়েছিল।"

উমাপতির চক্ষুর দৃষ্টি ম্লান, ললাটের শিরা স্ফীত হইল। ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "ঠিক মনে নেই, হয়তো হয়েছিল।"

"মহাপ্রতীহারের নিকট সেই যুবক গুর্জর-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত। তিনি আশা করেন, আপনাদের দুজনের কাছ থেকে এবিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রমাণ লাভ করা যাবে। অভিযোগ গুরুতর, তাই গুপ্তমন্ত্রণাগৃহে বিচার-সভার অধিবেশন হয়েছে। কিন্তু আর বিলম্ব করবেন না। অনুগ্রহ করে এবার চলুন।"

সৈনিকগণের সঙ্গে তিনজনে উদ্যানের বাহিরে আসিলেন। সুনন্দা কম্পিত বক্ষে সকলের পশ্চাতে আসিতেছিল। দ্বারের সম্মুখে আসিয়া গৌরীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, যদি এই হতভাগ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ সপ্রমাণ হয়ে যায়, তবে তার কি শাস্তি হবে বলতে পার?"

"প্রাণদণ্ড। গুর্জর-সাম্রাজ্যে ষড়যন্ত্রের কোন ক্ষমা নেই।" ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া গৌরীপতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বন্ধু ও বন্ধুকন্যাকে কি বন্দীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, না তার বিরুদ্ধে?"

"বিরুদ্ধে।"

আর কোন কথা হইল না। অন্ধকারে কেহ দেখিল না, সুনন্দার মুখ সহসা কতখানি পাণ্ডুর হইয়া গেল। কেহ বুঝিল না, এই সামান্য কয়েকটি কথার আঘাত তাহার অম্লান কুমারী-হৃদয়ে কি অশান্ত ঝটিকার সূত্রপাত করিয়া দিল।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

বন্দী সুরথদেব পালসাম্রাজ্যের এক সুবিখ্যাত মহানায়কবংশের একমাত্র পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর খুল্লতাতের সহিত নানাকারণে মনান্তর হওয়াতে পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া জীবনের বাকী দিনগুলি উজ্জয়িনীতে কাটাইয়া দিতে আসিয়াছিল। ভাগ্যবিপর্যয়ে গুরুতর ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তাহাকে রাজদ্বারে দাঁড়াইতে হইয়াছে। মনের জ্বালা ভুলিবার জন্য যে বংশপরিচয় গোপন করিয়া সে অজ্ঞাতবাসে আসিয়াছিল, এই সঙ্কটের মুহূর্তেও সেই আভিজাত্যের দাবী করিয়া আপনাকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিতে তাহার মন চায় নাই। মহাপ্রতীহারের গুপ্তমন্ত্রণাগৃহে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া গর্বোন্নত মস্তকে অবিচলিত দৃষ্টিতে সে দাঁড়াইয়াছিল। অপরাধ সপ্রমাণ হইলে সূর্যোদয়ের পূর্বে যে তাহার প্রাণদন্ড হইয়া যাইবে, একথা সে জানিত। কিন্তু চতুর্দিকের ক্রূর দৃষ্টি অথবা ঘাতকের শাণিত খড়্গের বিভীষিকা তাহার আকৃতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই।

পিতা ও পিতৃবন্ধুর সঙ্গে সুনন্দা যখন কম্পিত পদে বিচারগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন মহাপ্রতীহার নিবিষ্টমনে পূর্বতোরণাধিপ মহানায়ক অনন্তসিংহের নিকটে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিতেছিলেন। অভিযোগ সুরথদেবের বিরুদ্ধে সত্যই গুরুতর। তিন বৎসর পূর্বে সে যখন উজ্জয়িনীতে আসিয়াছিল, তখন তাহার অনুচরগণের অধিকাংশ যে গৌড়দেশীয়, একথা অনেকেই জানিত। নগরতোরণে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্বে কয়েকজন সম্ভ্রান্তবংশীয় বিদেশী সৈনিকের সহিত তাহার নিভৃতে আলাপও উজ্জয়িনীর গুপ্তচরদিগের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহার পর এই তিন বৎসর সুরথদেবকে দুই তিন বার গৌড়-বঙ্গে যাত্রা করিতে দেখা গিয়াছে। গৌড় হইতেও যে বহুবার সংবাদবাহী ভৃত্য আসিয়া তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে, সে কথাও মহাপ্রতীহারের

অপরিজ্ঞাত নয়। সম্প্রতি গুর্জরসেনাপতির শিবিরে গোপনে প্রবেশ করিয়া গুপ্তমন্ত্রণাসভায় কান পাতিতে গিয়া যে ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, আজ জানা গিয়াছে, সে গৌড়ীয়। বীরভদ্র নামে একজন গুপ্তচর ও তাহার সঙ্গী বজ্রমুখ সংবাদ দিয়া গিয়াছে, লোকটা ধরা পড়িবার কিছু পূর্বে তাহারা সুরথদেবকে শিবিরের অতি নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল। তাই আজ মহানায়ক অনন্তসিংহ মহাপ্রতীহারের নিকটে সুরথের বিরুদ্ধে পালসাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে গুর্জর সম্রাটের রাজত্বে গুপ্তচর-বৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

পাল ও গুর্জরবংশের মধ্যে বিরোধ বহুকালের—বহুদিন পর্যন্ত দুই শক্তিতে উত্তরাপথের আধিপত্য লইয়া সংঘর্ষ চলিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বাহিরে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তি বিরাজ করিলেও যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন উপলক্ষ্য লইয়া উভয়ের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধবিগ্রহ বাধিয়া যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। সুরথদেবকে লইয়া মহাপ্রতীহার তাই বেশ একটু মুশকিলেই পড়িয়াছিলেন। সমাগত মহানায়কদিগের ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, ষড়যন্ত্র যদি সপ্রমাণ হয়, তাহারা একবাক্যে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবে। কিন্তু যথোপযুক্ত প্রমাণ না পাইয়া সুরথদেবকে বধ্যভূমিতে প্রেরণ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সুরথ নিজে কিছু প্রকাশ না করিলেও সে যে সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা মহাপ্রতীহার অনুমানেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কতকটা সেজন্যও যতটা সম্ভব প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া তাহার প্রতি কোন দণ্ডবিধান করা তিনি সমীচীন বোধ করেন নাই।

অন্যান্য গুপ্তচরদের ডাকিয়া সুরথদেবেব সম্বন্ধে তাহারা কি জানে জিজ্ঞাসা করাতে দেখা গেল, তাহারা সকলেই বীরভদ্র ও বজ্রমুখের সঙ্গে একমত। সুরথদেব যে গৌড়ের গুপ্তচর সে বিষয়ে তাহাদের কাহারও সন্দেহ নাই। তাহারা নাকি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে, সুরথদেবের গতি-বিধি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। বন্ধুদের নিকটে 'মহাকালমন্দিরে যাইতেছি' বলিয়া যাইবার কিছু পরেই তাঁহাকে শিপ্রাতীরে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। 'চতুষ্পাঠিতে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে চলিলাম' বলিয়া গিয়া সুরাবিপণির দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাস্যালাপে মত্ত হইতে তাহার বাধে না। বাহিরে তাহার বন্ধু ও প্রতিবেশিগণ তাহাকে অতিশয়

সাধুচরিত্র ও সংযত-প্রকৃতি বলিয়া জানিলেও অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের সঙ্গে তাহাকে মাঝে মাঝে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলিতে দেখা গিয়াছে। কোন একটা গোপন উদ্দেশ্য না থাকিলে এরূপ কপট আচরণের কি সার্থকতা আছে?

গুপ্তচরদিগের সাক্ষ্যের পর মহানায়কবৃন্দের ললাটের ভ্রূকুটি আরও কুটিল হইয়া উঠিল। বন্দীর অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ আগেও ছিল না, এখন তো আরও রহিল না। অনেকেই মহাপ্রতীহারের মতামতের জন্য অসহিষ্ণুভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একজন সামান্য বিদেশীকে ঘাতকের হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহার এতটা ইতস্ততঃ করিবার কোন কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। সভামণ্ডপে অধীর অসন্তোষের একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। কিন্তু মহাপ্রতীহার সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া উমাপতি শ্রেষ্ঠীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করবেন মহাশ্রেষ্ঠী, অসময়ে আপনাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আপনাদের অসুবিধা উৎপাদন করতে বাধ্য হয়েছি—কিন্তু ন্যায় বিচারের অনুরোধে আপনি বন্দীর সম্বন্ধে কি জানেন, তা অনুসন্ধান না ক'রে আমার উপায় ছিল না। এই যুবকের সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ কবে হয়েছিল, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বলবেন কি?"

সভামণ্ডপের এক কোণে দাঁড়াইয়া উমাপতি নীরবে বন্দীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। সুনন্দা বিস্মিত হইয়া দেখিল, মহাপ্রতীহারের এই প্রশ্নে সহসা তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণে নিজেকে সংযত করিয়া তিনি ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বন্দী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এর বিষয়ে কোন কথাই আমি আপনাকে বলতে পারব না।"

মহাপ্রতীহার অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন মহাশ্রেষ্ঠী? তিন বৎসর পূর্বে আপনি যখন প্রথম এ নগরে পদার্পণ করেন, তখন তো এ যুবক আপনার সঙ্গী ছিল?" পূর্বের ন্যায় শান্তস্বরে উমাপতি উত্তর করিলেন, "আপনি যে সময়ের কথা উল্লেখ করছেন, তার কোন স্মৃতি আমার নেই। এইজন্যই বলেছি, এ যুবকের সম্বন্ধে আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

মহাপ্রতীহার ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"মহাশ্রেষ্ঠী কি কোন কারণে স্বদেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্য সত্য গোপন করতে চেষ্টা করছেন? আমার পরামর্শ শুনুন, বন্দী সম্বন্ধে যতটুকু আপনি জানেন, সব কথা আমাকে খুলে বললেই আপনি তার সবচেয়ে বেশী উপকার করবেন। এমন কি কারণ হতে পারে, যার জন্য মাত্র তিন বৎসর পূর্বের ঘটনা আপনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন?"

উমাপতি স্থির দৃষ্টিতে একবার মহাপ্রতীহারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই শান্ত অথচ মর্মভেদী দৃষ্টিতে মহানায়কগণের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। উমাপতি বলিলেন, "আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলিনি। বহুবৎসর নির্জন কারাবাসের ফলে আমার বুদ্ধিভ্রংশ, স্মৃতি-শক্তি লোপ হয়ে গিয়েছিল। আমার কন্যার অক্লান্ত শুশ্রূষা বহুকাল পরে সেই লুপ্ত শক্তিকে কোনমতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। দুই বৎসর আগেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র আমার মেয়ের মুখ ছাড়া, এই সময়ের কোন কথা, কোন ঘটনা আমার মনে পড়ে না। আমাকে আর কোন প্রশ্ন করা নিরর্থক।"

মহানায়কগণ সকলে বিস্মিত নেত্রে উমাপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রেষ্ঠীর কথার ইঙ্গিত বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। পাটলিপুত্রের ভূগর্ভ-প্রোথিত অন্ধকূপগুলির কথা লোক পরম্পরায় অনেকের কর্ণেই আসিয়া পেঁীছিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত কোন বন্দীকে জীবন্ত ফিরিয়া আসিতে পশ্চিম ভারতে কেন, গৌড় বা মগধেই কেহ কোনদিন দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। উমাপতির নিকট হইতে তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ তাহাদের পাইয়া বসিল। কিছুক্ষণের জন্য যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান বন্দীর কথাও তাঁহারা সকলে ভুলিয়া গেলেন। এমন কি স্বয়ং মহাপ্রতীহারের মুখের অটল গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করিয়াও কিছুটা কৌতূহলের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন আপনাকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল, মহাশ্রেষ্ঠী?"

উমাপতি হস্তে মুখ ঢাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন, "সতেরো বৎসর।"

"বিনাপরাধে?"

"বিনাপরাধে।"

মহাপ্রতীহার অধিকতর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৌতূহল মার্জনা করবেন, কিন্তু কি কারণে এই নিষ্ঠুর দণ্ড আপনাকে ভোগ করতে হয়েছিল, সেকথা জানতে আমরা সবাই উৎসুক হয়ে আছি। কার ষড়যন্ত্র এর মূলে ছিল, সে বিষয়ে কি আপনি পরে কোন অনুসন্ধান করেন নি?"

উমাপতির মুখে তীব্র-যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা করবেন, ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না! এই প্রসঙ্গের আলোচনা করতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।" গৌরীপতি পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে এক পাশে সরাইয়া লইয়া গেলেন। সভায় পুনরায় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। তখন মহাপ্রতীহারের আহ্বানে সুনন্দা ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যতক্ষণ মহাপ্রতীহার উমাপতি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, বন্দী ততক্ষণ করুণাপূর্ণ নেত্রে ভাগ্যবিড়ম্বিত এই হতভাগ্য বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, নিজের বিপদের চেয়েও এই যে মানুষটি নিষ্ঠুর নিয়তির হস্তে ক্রীড়নকরূপে পরিণত হইয়া অকালে জীবনের সমস্ত সুখসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার জন্যই তাহার হৃদয় অনুকম্পা ও সমবেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সভাস্থলে আসিয়া যখন সুনন্দা তাহার ব্যথিত, করুণাস্নিগ্ধ দুটি চক্ষু তুলিয়া পুনঃ পুনঃ চকিত কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তখন সেই কোমল, সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহার সযত্নরুদ্ধ ধৈর্যের বাঁধ যেন এতক্ষণে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল। অন্তরের কিঁ এক গোপন বিস্ময়ে তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিয়া পুনরায় নিষ্প্রভ, পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুরথের এই আকস্মিক পরিবর্তন কাহারও চোখে পড়িল না। উমাপতির মুখে ক্ষণপূর্বে শ্রুত সুনন্দার পিতৃসেবার ইতিহাস এবং তাহার অসামান্য সৌন্দর্য—দুই-ই সভায় উপস্থিত জনসাধারণের চক্ষু যেখানে সুনন্দা নতনেত্রে মহাপ্রতীহারকে অভিবাদন করিবার জন্য দুটি কোমল কর যুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

সুনন্দার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কোমল কণ্ঠে মহাপ্রতীহার

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা বন্দীকে চিনতে না পারলেও তুমি বোধ হয় এঁকে চিনতে পেরেছ?"

সুনন্দা নীরবে মাথা হেলাইয়া জানাইল—পারিয়াছে।

"তিন বৎসর পূর্বে তোমাদের প্রথম উজ্জয়িনী প্রবেশের দিন ইনি কি তোমাদের সঙ্গী ছিলেন?"

সুনন্দা পুনরায় নিরুত্তরে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

"সেদিন তোমার সঙ্গে তাঁর কি কি কথা হয়েছিল, তুমি কি আমাকে মনে করে বলতে পারো?"

সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বিশেষ কথা কিছু হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না। আমার বাবা তখন অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁকে নিয়েই সারাপথ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। পথে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সে খোঁজ নেবার জন্য বার বার ইনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। তখন গৌরীপতি কাকার সঙ্গে তাঁর টুকরো টুকরো দু'চারটে যা কথা হয়েছিল, তাই-ই কেবল শুনেছিলাম।"

"পাল বা গুর্জর রাজ্যের বিষয়ে কোন আলোচনাই কি তিনি সেদিন করেন নি?"

সুনন্দা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "না, তেমন স্পষ্ট করে কোন কথা বলতে আমি শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!"

"ভালো ক'রে আবার ভেবে দেখ, এ বিষয়ে কোন কথাই কি হয়নি সেদিন?"

অনিচ্ছুক কণ্ঠে উত্তর আসিল, "গৌড় ছেড়ে পশ্চিমে কেন যাচ্ছেন, একথা গৌরীপতি কাকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি শুধু বলেছিলেন, একটা গুরুতর কাজের ভার নিয়ে তিনি বিদেশে যাত্রা করছেন, আর সে কাজের পক্ষে উজ্জয়িনীই সকলের চেয়ে উপযুক্ত স্থান। কতদিন তাঁকে উজ্জয়িনীতে থাকতে হবে সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সেকথা ঠিক ক'রে বলবার কোন উপায় তাঁর নেই। আর তো আমার উল্লেখযোগ্য কোন কথা মনে পড়ছে না।"

বাধা দিয়া মহাপ্রতীহার বলিলেন, "তাঁর কুলশীল বংশপরিচয় কিছু কি সেদিন তোমাদের কাছে তিনি প্রকাশ করেছিলেন?"

সুনন্দা বলিল, "নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি শুধু বলেছিলেন,

'আমার নাম আমার একমাত্র পরিচয় হোক—আমার বিষয়ে আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।' কিন্তু তাঁর বংশপরিচয় জানতে আমাদের কোন আগ্রহ হয়নি। তাঁর সদয় ব্যবহারটিই আমরা শুধু মনে করে রেখেছিলাম।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

মহাপ্রতীহার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কোন বিদেশী সৈনিকের সঙ্গে তাঁকে তুমি পথে গোপনে আলাপ করতে দেখেছিলে কি?"

কাতর চক্ষু দুটি মহাপ্রতীহারের দিকে তুলিয়া সুনন্দা বলিল, "গৌড় ছেড়ে আসবার তিন দিন পরে দুজন সম্ভ্রান্তবংশীয় অশ্বারোহীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। উজ্জয়িনী পর্যন্ত তাঁরা আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন। ইনি তাঁদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। আমার বাবার অবস্থা তখন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়াতে শিবিকার আবরণ ফেলে দিয়ে তাঁকে নিয়েই আমি অতিশয় বিব্রত ছিলাম। তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল, কিছুই আমি শুনতে পাইনি।"

একথা শুনিয়া মহাপ্রতীহারের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি অনন্তসিংহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গুপ্তচরদের বিবরণের পর এ'র কথা শুনে আমার মনে বন্দীর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ ক্রমশঃই দূর হয়ে যাচ্ছে। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে সুরথদেব উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। সে কাজ যে কি, তাও তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করে বলতে চাচ্ছেন না। এ অবস্থায় এ'কে চরমদণ্ড দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কি করবার থাকতে পারে?"

শুনিয়া সুনন্দা অর্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় সম্মুখের পতাকাদণ্ড চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার দিকে চাহিয়া বন্দীর মুখ বেদনায় পুনরায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। কিন্তু সমবেত মহানায়কগণের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নেও সে আপনার পূর্ব-ইতিহাস অথবা উজ্জয়িনীতে আগমনের উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। কেবল বলিল, "যে কথা একান্তভাবেই কেবল আমার এবং আমার পরিবারের নিজস্ব বস্তু, প্রকাশ্যে সে কথা আলোচনা করতে আমি পারব না। এজন্য যদি আমার প্রাণ যায়, তাহলেও কিছু করবার উপায় আমার নেই।"

অগত্যা মহাপ্রতীহার প্রহরীদিগকে বন্দীকে সরাইয়া লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

সুনন্দা এতক্ষণ প্রাণপণে আপনার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া মহাপ্রতীহারকে কি একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছিল। এইবার সে লজ্জা ভুলিয়া মিনতিপূর্ণ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "আর একটু—আর একটু অপেক্ষা করুন—বিনা বিচারে নিরপরাধকে কেন এত বড় দণ্ড দেবেন?"

সভাশুদ্ধ সকলের বিস্মিত দৃষ্টি তাহার উপরে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া সুনন্দা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কিন্তু তবুও মহাপ্রতীহারকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে পুনরায় অনুনয় করিয়া বলিল, "বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তো এখনও প্রমাণিত হয়নি, তবে কেন আর কোন অনুসন্ধান না ক'রে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিচ্ছেন?"

মহাপ্রতীহার ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রমাণ আমাদের যা দরকার ছিল, তোমার নিজের কথাতেই তো তার অনেকটা আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে!"

সুনন্দা এবার গ্রীবা উন্নত করিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় মার্জনা করুন, কিন্তু অনাথ, আর্ত, অসহায়কে সাহায্য করা কি অপরাধ? আমি তো এঁর সম্বন্ধে কেবল একথা জানি বলেই আপনাদের বলেছিলাম!"

"না, আর্তসেবা অপরাধ নয়। কিন্তু ছদ্মনামে উদ্দেশ্য গোপন ক'রে উজ্জয়িনীতে আসা, পথে একান্তে গৌড়ীয় সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ, সর্বাবস্থায় আত্মপরিচয় দানে একান্ত অনিচ্ছা—এ সবই কি অপরাধীর মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে না? সত্যি করে বলো তো, তাঁর এই রহস্যপূর্ণ ব্যবহার সেদিন তোমার মনেও কি কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি?"

এ কথার পর সুনন্দা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। মহাপ্রতীহারের কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অশ্রু-আবিল নেত্র সুরথদেবের উপর সংস্থাপিত করিয়া সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "না, না, কোন মন্দ ধারণাই ওঁর সম্বন্ধে আমার হয়নি। আমি তখন একেবারেই অসহায়, বিপন্ন! অসমর্থ, রুগ্ন পিতাকে নিয়ে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসতে কত অসুবিধাই

যে আমার হতো, যদি এই অপরিচিত বন্ধুটি আমাদের সঙ্গে না থাকতেন! সে যে কত করুণা, জন্মদুঃখীর প্রতি কত দয়া, সে কথা কেমন ক'রে আপনাদের বলব? সেদিন যেন ওঁকে আমরা বিধাতার আশীর্বাদ রূপেই পেয়েছিলাম! আজ আমার কোন সাক্ষ্যে তাঁর ক্ষতি হবে, একথা মনে করতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। সেই উপকারের এই প্রতিদানই কি তবে আমি দিলুম?" উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বন্যায় পুনরায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুনন্দার কাতরতা দেখিয়া মহানায়কদিগের কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে তরুণবয়স্ক কেহ কেহ অশ্রুগোপন করিতে মুখ ফিরাইলেন। মহাপ্রতীহার ঈষৎ কোমলভাবে বলিলেন, "তুমি এত দুঃখিত হয়ো না। রাজদ্বারে সত্যপ্রকাশ তোমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল। কেবল কর্তব্যের অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছায় তুমি যে একথা বলতে বাধ্য হয়েছ, তা আমরা যেমন বুঝতে পারছি, বন্দীও নিশ্চয়ই তেমনি বুঝেছেন। তাতে তোমার কুণ্ঠিত হওয়ার তো কিছুই নেই!"

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "বীরভদ্র ও বজ্রমুখের সাক্ষ্য বন্দীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাদের কথা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন না হলে এবিষয়ে আমার আর কিছুই করণীয় নেই। আমি ন্যায়বিচারের প্রতিনিধি, প্রমাণানুযায়ী বন্দীকে শাস্তি দিতে আমি বাধ্য। এ বিষয়ে আর আলোচনা নিষ্ফল।"

বন্দীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি অনন্ত সিংহের সহিত মৃদুস্বরে কি একটা প্রয়োজনীয় কথার আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। সকলেই বুঝিল, সুরথদেবের জীবনের কোন আশাই আর নাই।

যতক্ষণ সুনন্দা কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ভরিয়া মহাপ্রতীহারের নিকট বন্দীর জীবন ভিক্ষা করিতেছিল, সুরথ ততক্ষণ মুগ্ধ, একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। এই তরুণীর কমললাটের শুভ্রতা, সমস্ত দেহে বিচ্ছুরিত অপরূপ লাবণ্যের দীপ্তি, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নের অপূর্ব করুণা দেখিয়া দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, বুঝি স্বয়ং পদ্মজা তাহার দুর্দশা দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে বিশালার তোরণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এখন সহসা তাহারই বিপদাশঙ্কায় সেই স্থির সৌন্দর্যের প্রতিমাকে এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িতে দেখিয়া, একদিকে যেমন

গভীরতম বিষাদে তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল, অপরদিকে তেমনি একটি বেদনামিশ্রিত অস্ফুট সুখের বিজলী অন্ধকার হৃদয়-প্রান্তে থাকিয়া থাকিয়া চমকিতে লাগিল। সুনন্দার চিত্ত তবে তাহার আয়ত্তের বাহিরে ছিল না? সে যে সেই প্রথমদর্শনের দিনটি হইতে তাহার হৃদয়ের সমস্ত সম্পদ এই শ্রেষ্ঠীকন্যার রক্তিম চরণ দুটিতে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে, সে কথা তো নিজের কাছেও সে ভাল করিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই! পাছে নিকটে গিয়া দাঁড়াইলে তাহার অন্তরের স্পর্ধা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে শ্রেষ্ঠিভবনের দ্বারে গিয়া বহুদিন ফিরিয়া আসিলেও সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুনন্দার গোপন হৃদয়টি তাহার নিকটে প্রকাশিত করিয়া দিবার জন্যই কি এই নিদারুণ বিপদ তাহার জীবনে আসিয়াছিল?

পরক্ষণে তাহার অন্তঃকরণ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। হায়! আজ আর এ দেবভোগ্য সম্পদ করায়ত্ত জানিয়াই বা কি ফল? মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়ার প্রতি আলিঙ্গন-প্রয়াসী বাহু মেলিয়া কি লাভ হইবে?

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

সুনন্দার ব্যাকুলতা ও অশ্রুজল সুরথ ব্যতীত মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত আরও একটি ব্যক্তির একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল—সে অনন্তসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্ত। সভামণ্ডপে নাগশীর্ষ-খোদিত একটি স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে অনিমেষ নয়নে সুনন্দার মুখের প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিল। মহাপ্রতীহারের কথা সমাপ্ত হইলে সুনন্দা যখন বিবর্ণমুখে নিকটবর্তী একখানি আসনে বসিয়া পড়িল, তখন জয়ন্ত ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিল। তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর অস্বাভাবিক প্রখর জ্যোতি ও ললাটের কুঞ্চিত রেখা কেহ যদি তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তবে তাহার নিশ্চয় মনে হইত, সে একটা গুরুতর সমস্যা হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত

করিয়া অবশেষে সে কি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইল এবং ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া মহানায়কমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

মহাপ্রতীহার তখন বন্দীর বধদণ্ডের আদেশলিখিত ভূর্জপত্রখানির উপরে নিজহস্তের সঙ্কেতাঙ্গুরীয়কের চিহ্ন মুদ্রিত করিতেছিলেন। জয়ন্তকে এভাবে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কিন্তু জয়ন্ত তাঁহার দৃষ্টির বিরক্তিতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিল না। স্মিতমুখে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বেশ সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য, বন্দীর বিরুদ্ধে বীরভদ্র ও বজ্রমুখের প্রমাণই কি তাহলে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে?"

মহাপ্রতীহার উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মহানায়ক অনন্তসিংহ বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, তোমার ব্যবহার দিনের পর দিন ক্রমে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম ক'রে চলেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সভামণ্ডপে উপস্থিত থেকেও তুমি কি কিছুই শুনতে পাওনি, যে একথা আবার জিজ্ঞাসা করছ?"

নিজের চেয়ে বয়সে সামান্য বড় এই খুল্লতাতটিকে জয়ন্ত কোনদিনই পছন্দ করিত না। অনন্তসিংহের কথার উত্তরে সে কেবল একবার অবজ্ঞা-ভরে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় সমবেত মহানায়কবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনাদের সব কথাই আমি শুনেছি। কিন্তু শুনেও একটা বিশেষ প্রয়োজনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি—কেউ কি আমাকে উত্তর দেবেন, আমার কথাটা সত্যি কি না?"

জয়ন্তের কথার ভঙ্গী যে মহানায়কদের কাহারও বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করে নাই, তাহা তাঁহাদের মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতে-ছিল। কিন্তু এই যুবকটির অসাধারণ প্রখর বুদ্ধি ও ততোধিক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শক্তিকে তাঁহারা সকলেই ভয় করিয়া চলিতেন। নায়কমণ্ডলীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যশোধর্মা ধীরে ধীরে বলিলেন, "অন্যান্য প্রমাণ যতই প্রবল হোক না কেন, প্রধানত বজ্রমুখ ও বীরভদ্রের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই যে বন্দীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ আলোচনার যে এখন কি প্রয়োজন, তা বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে বেশ একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

জয়ন্ত যশোধর্মার কথার কোন উত্তর দিল না। এতক্ষণ সে ধীরে ধীরে,

অথচ এমন স্পষ্টকণ্ঠে কথা বলিতেছিল, যেন সভার সকল লোকেই তাহার কথা শুনিতে পায়। এখন কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া সে মহাপ্রতীহারকে ডাকিয়া বলিল, "দেব, তাহলে আমার একটা কথা শুনুন। মহানায়কগণ, আপনারাও শুনুন। বজ্রমুখ ও বীরভদ্র সাক্ষ্য দিয়েছে, সেনাপতি বজ্র-বর্মার শিবিরে গৌড়ীয় গুপ্তচর ধরা পড়বার কিছু পূর্বে তারা দুজনেই বন্দীকে শিবিরের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল। এই সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করেই আপনারা বন্দীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বীরভদ্র ও বজ্রমুখ কি সত্যি সত্যি বন্দীকেই সেদিন সেখানে দেখেছিল—অপর কাউকে নয়?"

অনন্তসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কথাগুলি বড়ই নির্বোধের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, জয়ন্ত! বীরভদ্র ও বজ্রমুখ এই তিন বৎসরে অন্তত সহস্র-বার সুরথদেবকে দেখেছে। প্রধানত তার গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যই এদের আমি নিযুক্ত করেছি। এক্ষেত্রে তাদের ভুল হওয়া কেমন ক'রে সম্ভব? এই অনর্থক আলোচনার বাস্তবিক কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। উজ্জয়িনীর মহানায়কমণ্ডলীর সময়ের একটা মূল্য আছে। তোমার মত অর্বাচীনের বাতুলতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত অবসর তাঁদের মোটেই নেই।"

"প্রয়োজন আছে বই কি, মহানায়ক! উজ্জয়িনীর মহানায়কমণ্ডলীর বিচারশক্তি যে কতদূর তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল, সেটা প্রমাণ করে দেওয়ার জন্যই এর প্রয়োজন আছে। জয়ন্তদেব অনর্থক এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়নি। আমি বলছি, বজ্রমুখ ও বীরভদ্রের সংবাদ মিথ্যা! সেদিন তারা দুজন বজ্রবর্মার শিবিরের নিকটে যাকে দেখে সুরথদেব বলে মনে করেছিল, সে আমি! সম্ভবতঃ সুরথ সেদিন তার নিজগৃহ ছেড়ে কোথাও যায়নি—একটু অনুসন্ধান করলেই এ তথ্য আপনাদের নিকটে প্রকাশিত হয়ে পড়বে।"

"জয়ন্ত!" মহানায়ক সিংহবর্মা আসন পরিত্যাগ করিয়া একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বিচারসভায় এ ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপের কোন সার্থকতা আছে বলে কি তুমি সত্যিই মনে কর?"

অবিচলিত কণ্ঠে জয়ন্ত বলিল, "বিদ্রূপ আমি আপনাদের করছি

না—আপনারাই আমাকে করছেন। একবার ভালো ক'রে আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো, আমাকে সুরথদেব বলে ভুল করাটা কি খুবই শক্ত?"

হীরকাঙ্গুরী-মণ্ডিত সুগৌর হস্তের লীলায়িত ভঙ্গীতে দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া জয়ন্ত মহাপ্রতীহারের দিকে চাহিল।

একটা অব্যক্ত বিস্ময়ের শব্দ মাত্র মহাপ্রতীহারের মুখ হইতে নির্গত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া একবার সুরথ, একবার জয়ন্তের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সভাস্থ সকলের চক্ষু জয়ন্তের মুখের উপরে আসিয়া নিবদ্ধ হইতে অত্যধিক বিস্ময়ে কেহ যেন আর একটি কথাও উচ্চারণ করিবার মত শক্তি খুঁজিয়া পাইল না। সে কি আশ্চর্য সাদৃশ্য! সেই গজদন্ত-পাণ্ডুর ললাটে সেই কৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছ, সেই সুগঠিত চিবুকের উপরে উন্নত, খড়্গতুল্য নাসিকা, বিশাল নয়নের কৃষ্ণ তারকায় সেই আশ্চর্য সম্মোহনী দৃষ্টি! একই প্রতিমার দুইখানি ছাঁচ কে আনিয়া এ দুইজনের মুখে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে! পাশাপাশি দাঁড়াইলে নিকটতম আত্মীয়ের পক্ষেও একজনকে অপর বলিয়া ভ্রম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। প্রভেদ শুধু উভয়ের ওষ্ঠাধর-সংস্থাপনে, চক্ষুতারকার অন্তরালে অন্তরাত্মার প্রকাশে। সুরথের চক্ষু শান্ত, দীপ্তিময় —প্রশান্ত অধরে ও ললাটে আশা এবং আনন্দের স্বপ্ন এই সংকটের মুহূর্তেও তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া সে যেন এখনও কোন্ স্বর্গীয় সুষমার সন্ধান পাইয়া তাহারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। জয়ন্তের স্বভাব-সুন্দর মুখ রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত, বহুদিবসের অত্যাচারে শিথিল—তাহার অবজ্ঞা ও বিদ্রূপে কুঞ্চিত অধরপ্রান্ত দেখিলে প্রথমেই মনে হয়, নিজের ও জগতের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া সে আশা নিরাশার সীমা অতিক্রম করিয়া আরও বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ভালো মন্দ, শুভাশুভ—কিছুই আর তাহার জীবনে অবশিষ্ট নাই। তাহার উদাসীন হৃদয়ের নিকট ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য—সবই সমান।

এই দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির মধ্যে যে সাদৃশ্যের কথা এতক্ষণ কাহারও মনে হয় নাই, জয়ন্তের একটি কথার আঘাতে যেন এক কৃষ্ণ

যবনিকা সরিয়া গিয়া তাহাকেই সকলের চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছিল। অপর সকলের মত সুনন্দাও অশ্রুকলঙ্কিত নেত্র তুলিয়া দেখিতেছিল, তাহার সম্মুখে দুইটি স্ফটিকপ্রতিমা—দুইটিই আকৃতিতে সম্পূর্ণ এক—কেবল একজনের হৃদয়ে যে অনির্বাণ প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার জ্যোতিতে তাহার ভিতর বাহির দুইই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; অপরের প্রদীপটি কোন্ দুরন্ত ঝটিকায় বহুদিন হয় নিবিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাহীন ম্লানদেহ জীবনের ধূলিধূসরিত পথে কোনও মতে আপনাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

সুনন্দার করুণাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে জয়ন্তের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মত অসহিষ্ণুতার একটা রুদ্ধ গর্জন করিয়া সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনাদের বিচারের প্রহসন কি এখনও সমাপ্ত হবে না? দণ্ড হোক্, মুক্তি হোক্, এবার একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলুন। এভাবে নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে থাকা যে অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

ক্রুদ্ধ অনন্তসিংহ চাপা গলায় তর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণ ঐকথা কেন গোপন করেছিলে?"

"প্রয়োজন বোধ করিনি মহানায়ক, মনে করেছিলাম শেষ পর্যন্ত হয়তো আপনাদের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ঘটনার সত্য স্বরূপটিকে প্রকাশ করেই দেবে। নিরপরাধের অনর্থক দণ্ড হতে চলেছে দেখে কেমন যেন মায়া হলো, তাই তো রাজকার্যে বাধা প্রদান করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু সে কথা যাক, এখন বন্দীর প্রতি কি আদেশ হয় জানতে উৎসুক আছি। আর বিলম্বে কি প্রয়োজন?"

অনন্তসিংহ পুনরায় রুদ্ধ রোষে গর্জন করিয়া উঠিলেন, "এই অসময়ে, এমন গভীর রাত্রে বজ্রবর্মার শিবিরের নিকটে তোমার কি প্রয়োজন ছিল?"

জয়ন্তের চক্ষুর দৃষ্টি শ্লেষে আরও প্রখর হইল। বিদ্রূপের কণ্ঠে সে বলিল, "নাগরিক সেনার অধ্যক্ষের গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করবার অধিকার মহানায়ক অনন্তসিংহ কবে থেকে লাভ করেছেন?" উভয়ের এই বাদানুবাদে মহাপ্রতীহারের ললাটে বিরক্তিকুঞ্চিত ভ্রূকুটি দেখা দিল। দৃঢ়হস্তে সম্মুখের অভিযোগপত্রাদি সরাইয়া দিয়া তিনি আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তবে কি মহানায়ক অনন্তসিংহের মতে এর পর জয়ন্তদেবকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করাই আমাদের কর্তব্য?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মহানায়কমণ্ডলীর দিকে চাহিতে তাঁহারা নীরবে মাথা হেলাইয়া আপনাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সভামণ্ডপে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রহরীর দল মহাপ্রতীহারের ইঙ্গিতে সুরথদেবের শৃঙ্খল খুলিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সামান্য দুই একটি কথায় তাহার নিকটে ভ্রমজনিত, অনিচ্ছাকৃত এই অভিযোগ ও অত্যাচারের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া মহাপ্রতীহার সভামণ্ডপ ত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিচারগৃহ জনশূন্য হইয়া গেল। শূন্য প্রাঙ্গণে রহিলেন শুধু সকন্যা উমাপতি, সদ্যবিমুক্ত সুরথ, গৌরীপতি ও জয়ন্ত।

বিষাক্ত ঊর্ণনাভের মত যে মৃত্যুবর্ষী জাল অনন্তবর্মা রাশি রাশি সাক্ষ্য ও প্রমাণের মধ্য দিয়া সুরথের চারিদিকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, জয়ন্তের একটি কথার ফুৎকারে তাহা এমন করিয়া খসিয়া পড়িতে দেখিয়া সুরথ যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে যেখানে সুনন্দা, গৌরীপতি ও উমাপতি দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিলেন, তাহার সমস্ত মন কেবল উন্মুখ হইয়া সেইদিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু কথা বলিবার বা নড়িবার শক্তি যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াও সে নীরবে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, অপরাধমঞ্চ ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিবার কোন চেষ্টাই করিল না। অদূরে একটি স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সুরথের অবস্থা দেখিয়া সে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বৈতরণীর তীর থেকে ফিরে এসেছেন বলে বুঝি পৃথিবীটাকে এখনও আপন বলে বোধ হচ্ছে না? যাক, এখানে আর বিলম্ব করবেন না। এবারে চলুন।"

যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া সুরথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব?" জয়ন্তের দৃষ্টি তাহার বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় প্রখর হইল, সে অর্থসূচক হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, যেখানে শ্রেষ্ঠীকন্যা আপনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন? তাঁর হৃদয়ের ভাবটি তো বিচারকালে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে! আপনার ভাগ্য ভাল, তাই অমন একজোড়া

কালো চোখের সহানুভূতি লাভ করেছেন। ও জিনিসটি পাবো জানলে আমরা একবার কেন, সহস্রবার বধ্যমঞ্চে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হতাম না।"

সুরথের ললাটে অসহিষ্ণুতার ছায়া পড়িতে দেখিয়া জয়ন্ত পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "শ্রেষ্ঠীকন্যা তো এখনও আপনার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হননি—যদিও অদূর ভবিষ্যতে যে হবেন, তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে—এখন একটু নির্দোষ পরিহাসে কেন এত চঞ্চল হয়ে উঠছেন? তাছাড়া যিনি আমার বন্ধুজায়া হবেন, তাঁর বিষয়ে একটু সরস আলোচনাতে কি আর এমন দোষ আছে?" তাহার পর একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, "অবশ্য এমনও তো হতে পারে যে, আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে আপনার মনে মনে যথেষ্ট আপত্তি হচ্ছে! আমার সঙ্গে আপনার যে সাদৃশ্য আজ আপনাকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে আনল তার জন্য হয়তো আপনি আনন্দের পরিবর্তে লজ্জাই বোধ করছেন।"

সুরথ তাহাকে বাধা দিয়া আগ্রহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "এসব আপনি কেন বলছেন বুঝতে পারছি না। আমি কি এতই অধম যে আজ আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তার মূল্য এত শীগ্‌গীর এমনি করে ভুলে যাব?"

"কেনই বা বুঝতে পারবেন না বন্ধু! আমি যখন গৌরবমণ্ডিত শিরে পৃথিবীর রাজপথে সসম্মানে উৎসব হতে উৎসবান্তরে ভ্রমণ করে চলেছি, বিনা আয়াসে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ আমার হাতে এসে ধরা দিচ্ছে—নারীর প্রেম, বন্ধুর স্নেহ, জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—তখন আমারই মূর্তিধারী আর কোন ব্যক্তি যদি আমার আশেপাশে পঙ্কিলতম পথগুলি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার কর্দমাক্ত ধূলিধূসরিত দেহকে যদি আমারই দেহ বলে ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে, তবে এ পৃথিবীতে এমন মহৎ হৃদয় কার আছে, যে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত না হয়ে পারে? বিধাতা আপনাকে আর আমাকে একই মূর্তির ছাঁচে ফেলে গড়েছিলেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যদি কোনদিন না ঘটতো, তাহলে তার জন্য আপনার সঙ্কুচিত হওয়ার কোন কারণ থাকতো না। আপনি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম, আমি আপনারই প্রতিমূর্তি, সেই সমাজেরই নিম্নতম স্তরের

অধিবাসী। অথচ আমার হাতে আজ আপনার মুক্তি—এ যেন বিধাতার একটি চমৎকার পরিহাস।”

কথাগুলির মধ্যে সত্যের অভাব ছিল না, তাই জয়ন্তের এ কথায় সুরথ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। সুনন্দার সজল চক্ষুর সকরুণ মিনতি ছাড়া অপর কাহারও হস্ত যে তাহাকে বন্দীশালা হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা মনে করিতে তাহার তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই বেশি বোধ হইতেছিল। তদুপরি গুপ্তচরগণ জয়ন্তকে সুরথ বলিয়া ভুল করিয়া সুনন্দার সম্মুখে তাহাদের এই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে যে সকল অপমানসূচক কথা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সুরথের মন ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। অতি গোপনে, অতি গভীর আগ্রহে সে সুনন্দার থর-কম্পিত ওষ্ঠাধর, ঘন পক্ষছায়ায় আবৃত আনত দুটি নেত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিল, কি সুন্দর! কি অনুপম! তাহার পুনঃ পুনঃ চকিত কটাক্ষ অনুভব করিয়া সুনন্দার মুখ থাকিয়া থাকিয়া আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তন্ময় হৃদয়ে সেই রক্তিম মাধুরী, প্রথম অনুরাগবিহ্বলা কুমারীর সেই লজ্জারুণ মুখচ্ছবি দুই নেত্র ভরিয়া পান করিয়া সুরথের হৃদয় হইতে সমস্ত গ্লানি যেন নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গেল। প্রফুল্ল হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জয়ন্তের দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে হাস্যতরল-কণ্ঠে বলিল, “অনর্থক এসব কথা বলে আমাকে দুঃখ দেবেন না, নিজেও মনে ক্লেশ রাখবেন না। আপনাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতে কোনদিনই আমি কুণ্ঠিত বোধ করব না। এবার আমার গৃহে চলুন, ভাল করে আপনার সম্বর্ধনা করি।”

সুরথের প্রফুল্লতায় জয়ন্তের মুখ আরও গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাত সরাইয়া সে অনুচ্চকণ্ঠে গম্ভীর স্বরে বলিল, “আপনাকে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিলুম, এখন দেখছি ততটা বুদ্ধিমান আপনি নন। আপনি কি সত্যি ভেবেছেন, আমি আপনাকে হঠাৎ দেখে খুব পছন্দ করে ফেলেছি বলেই এত কষ্ট ক’রে আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়েছি?

একটু বিস্মিত, একটু অসন্তুষ্ট হইয়া সুরথ বলিল, “না, তা মনে করিনি, তবে”—

“তবে ভেবেছিলেন যে আমার মহৎ হৃদয়ের উপচীকির্ষাই এর মূল?

ভুল করেছিলেন সুরথদেব, কোন মহৎ প্রবৃত্তি আমার এই অদ্ভুত ব্যবহার প্রণোদিত করেনি—কোন মহৎ প্রবৃত্তির স্থান আমার অন্তঃকরণে আজও আছে বলে আর মনে হয় না—এ শুধু আমার খেয়াল, আমার স্বেচ্ছাচারেরই অপর একটা অঙ্গ! আপনার উপকার আমি কেন করতে যাব? ভেবেছেন কি যে আপনাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে? আমি যে আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি না, প্রতি মুহূর্তে আপনার অনিষ্ট চিন্তা করছি না, সে কথা আপনাকে কে বলেছে? আমি যা হতে পারতাম, আপনি তা-ই; যে সুযোগ আমি অবহেলায় নষ্ট করে জীবনের সব হারিয়েছি, তাই আপনাকে আজ সৌভাগ্যের চরম শিখরে তুলে ধরেছে। আপনাকে আমি কেন ঘৃণা করব না?"

বলিতে বলিতে তাহার মুখে এত অপরিসীম তিক্ততার হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিয়া চলিল, "এ ভালোই হয়েছে বন্ধু, যে বিধাতার বিধানে আমাদের দুজনের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছে। যদি তা না হতো, তাহলে কে জানে, সুনন্দা দেবীর যে সপ্রেম দৃষ্টি লাভ করে আপনি এত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, তাঁর প্রসন্নতা লাভ করবার সৌভাগ্য সেদিন আপনার চেয়ে আমারই বেশি হতো কি না! কিন্তু ভয় নেই, প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবার মত যোগ্যতা আমার নেই, সে বিষয়ে আমার আগ্রহও ইহজীবনে হবে না। নারীর প্রেম আমার কাছে খুব বড় একটা বস্তু বলে কোনদিনই বোধ হয়নি। অতএব সুনন্দা দেবীর হৃদয়ের ওপরে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে আপনি এখন অগ্রসর হোন, আপনার জয়যাত্রা শুভ হোক, সার্থক হোক। আমার মত অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব থেকে আমি আপনাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি।"

নিরুত্তর সুরথের প্রতি একবার অবজ্ঞাকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জয়ন্ত শিবিকা-প্রবেশোদ্যত উমাপতির সম্মুখীন হইল। "মহাশ্রেষ্ঠি! আপনার কৃতজ্ঞতা অর্জন করবার মত কোন পুণ্য আমার হয়নি, আপনার স্নেহের যোগ্যও আমি নই। কিন্তু আপনার চরণপ্রান্তে একটু স্থান পেতে এ দাসের গভীর আগ্রহ—হতভাগ্যকে সে আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত করবেন না।"

বিস্মিত উমাপতি গৌরীপতির দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন, "ইনি তোমার বা আমার পরিচিত না হলেও আমাদের মহা উপকারী বান্ধব—আজ

বিচারসভায় এ'রই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আমাদের বন্ধু সুরথদেব বধদণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছেন।"

তখন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উমাপতি জয়ন্তের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার নাম ও পরিচয় দুইই আমার অজ্ঞাত, এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ কি তুমি পূর্ণ করবে না?"

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার সুরথের, একবার অবনতমুখী সুনন্দার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্ত ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমি নাম-গোত্র-পরিচয়-হীন, রাজপথের অবজ্ঞাত ধূলিকণা, আপনাদের—আপনার—দাসানুদাস।"

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় ছয়মাস পরে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের এক নির্জন অংশে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ অসহিষ্ণুভাবে পথের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তখন সূর্যাস্তকাল—রাঢ়দেশের রক্তিম মৃত্তিকা অস্তগামী সূর্যের শেষচুম্বন লাভ করিয়া অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে যতদূর চোখ যায়, পথের দুইপার্শ্বে কেবল জনহীন, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি আর দূরে মৃত্তিকাস্তূপের অন্তরালে বৃক্ষের পর বৃক্ষের শ্রেণী। আসন্ন গোধূলির অপরূপ আলোকে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে সৌন্দর্যের রাশি কে যেন মুঠি ভরিয়া দিকে দিগন্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই সুবর্ণসমাবেশের মধ্যে যে ব্যক্তি একাকী দাঁড়াইয়া-ছিল, তাহার মন অথবা চক্ষু, কোনটাই যে সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা তাহার ভ্রূকুঞ্চিত মুখ এবং অসহিষ্ণু ভাবভঙ্গী স্পষ্টই বলিয়া দিতেছিল।

অশ্বারোহী পুরুষের বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর—তাঁহার সুদৃঢ় দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট ও গর্বিত দৃষ্টিতে আভিজাত্যের গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কটিতে সুবর্ণখচিত কটিত্রাণ—হস্তে শাণিত কৃপাণ। বিশাল যুগ্ম ভ্রূরেখার নিম্নে জ্যোতিঃপূর্ণ কৃষ্ণ-চক্ষুর দৃষ্টি অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরের প্রান্তদেশে কয়েকটি কুঞ্চিত রেখা তাঁহার অন্তরস্থিত দর্পিত অবজ্ঞা, ঔদ্ধত্য এবং

অবহেলার পরিচয় বহন করিতেছিল। সেই নির্জন প্রান্তরে এই অশ্বারোহীকে দেখিয়া যে-কেহ অনায়াসে তাঁহাকে একজন দিকপাল বলিয়া ভ্রম করিতে পারিত। তাঁহার অশ্বটির সজ্জা এবং দেহ-সৌষ্ঠবেও যে আভিজাত্য এবং প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন বর্তমান ছিল, সাধারণ সেনানায়ক-সমাজেও তাহা বড় সুলভ নয়। তাহার ঘনকৃষ্ণ দেহটি বেষ্টন করিয়া যে মণিরত্ন-খচিত অঙ্গমালা দুলিতেছিল, তাহার মূল্যই সহস্রাধিক সুবর্ণমুদ্রা হইবে। রেশমের ন্যায় চিক্কণ কেশরশোভিত সুঠাম গ্রীবাটি বাঁকাইয়া সে এতক্ষণ একমনে তৃণান্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। প্রভুর অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিয়া অবশেষে সে-ও একবার গম্ভীর স্বরে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল।

প্রান্তরের বুকে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি ভাল করিয়া মিলাইয়া যাইতে না যাইতে দূরে দ্বিতীয় একটি অশ্বের দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে ধূলায় ধূলায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া একজন অশ্বারোহী যুবক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী এবং অশ্ব উভয়েই তখন বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ললাটের স্বেদজল মুছিতে মুছিতে যুবক একটু অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল, "আপনার প্রেরিত সংবাদ পেয়েই আমি যতদূর সম্ভব শীঘ্র চলে আসতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আমার যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমায় মার্জনা করুন।"

প্রৌঢ়ব্যক্তির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া ঈষৎ শ্লেষাত্মক সুরে তিনি বলিলেন, "ক্ষমা প্রার্থনার কি প্রয়োজন সুরথ? মহানায়ক বিগ্রহদেবকে পথের পার্শ্বে অর্ধপ্রহর এভাবে প্রতীক্ষা করিয়ে রাখবার স্পর্ধা এপর্যন্ত আর কারুর হয়নি। কিন্তু তুমি যখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, সে অধিকার তোমার আছে বই কি!"

সুরথের মুখ এই বিদ্রূপ-বাক্যে আরক্ত হইয়া উঠিল। বহুকাল পিতৃভূমি হইতে অনুপস্থিতির পর প্রথম সাক্ষাতেই পিতৃব্যের এই সম্ভাষণ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন পরে অকস্মাৎ আমাকে আহ্বান করেছেন কেন?"

বিশাল গুম্ফের অন্তরালে বিগ্রহদেবের অধরে একটি অর্থসূচক মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এটা কি তোমার বড় অস্বাভাবিক প্রশ্ন হলো না সুরথ? তুমি আমার মৃত ভ্রাতার একমাত্র পুত্র, আমাদের

বংশের সমস্ত সম্মান ও কুলগৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী। বহুদিন তোমাকে দেখিনি, আজ যদি সাক্ষাৎ করতে চেয়েই থাকি তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?”

সুরথ কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “আমাকে দেখবার জন্য আপনি যে মোটেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি, সে কথা আমি জানি। সম্ভব হলে উজ্জয়িনীর কারাগারে অথবা বধ্যভূমিতে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিতেও যে আপনি কুণ্ঠিত হতেন না, সে কথাও আমার অজানা নেই। এখন কিজন্য আমাকে আহ্বান করেছেন, সেটাই বরং খুলে বলুন।”

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার মুখ পর্যবেক্ষণ করিয়া বিগ্রহদেব বলিলেন, “অনেক কথাই যে তাহলে জানো দেখছি। লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতাতেও তোমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভাল, ভাল। কিন্তু তোমার এই জ্ঞানের উৎসমুখটি কে, একবার শুনতে পাইনে?”

—“আমার জানাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? সেনানায়ক গৌরীপতি আমার মুক্তির পর এবিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন, গুপ্তচর বজ্রমুখ আপনার নিযুক্ত লোকের নিকটে উৎকোচ গ্রহণ করেই আমার বিরুদ্ধে গুর্জর দরবারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করতে সম্মত হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তাঁরা জানতেন না বলে একথা প্রকাশ হওয়ায় আশ্চর্য হয়েছিলেন। আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে খুব সহজ ও স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করেছিলাম!”

ভ্রাতুষ্পুত্রের উক্তির শ্লেষটুকু গায়ে না মাখিয়া বিগ্রহদেব নিস্পৃহকণ্ঠে বলিলেন, “সমাজের ও বংশের মঙ্গলের জন্য যদি বাধ্য হয়ে আমাকে তা করতে হয়েই থাকে, তাতে আর দুঃখিত হয়ে লাভ কি! কিন্তু এই গৌরীপতিটি কে? উমাপতি শ্রেষ্ঠীর বন্ধু ও তাঁর উদ্ধারকর্তা নয় কি? তাঁরাও তো শুনেছি এখন উজ্জয়িনীতেই আছেন!”

সুরথকে নিরুত্তর দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি আবার বলিলেন, তাঁদের সঙ্গেও তাহলে পরিচয় হয়েছে? ভাল, ভাল! শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনন্দা দেবী শুনেছি খুবই সুন্দরী। রাজান্তঃপুরেও এমন সৌন্দর্য বড় একটা দেখা যায় না। শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে যাতায়াতের অধিকার লাভ করে তোমার তাহলে সুবিধেই হয়েছে?”

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিরুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করিয়া আরক্ত, স্ফীতমুখে সুরথ বলিল, "শ্রেষ্ঠীকন্যার প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন—কথা হচ্ছিল আপনার সঙ্গে আমার—একজন কুলমহিলার নাম এভাবে তাতে টেনে আনার কি প্রয়োজন আছে?"

বিগ্রহদেবের মুখে পুনরায় ঈষৎ হাস্য দেখা দিল। অলসভঙ্গীতে তিনি বলিলেন, "এর মধ্যেই এত দূর? তা উমাপতি শ্রেষ্ঠী যে সকন্যা গৌড়-ত্যাগ করে যেতে পেরেছেন, সেটা তোমার পক্ষে তাহলে অতিশয় মঙ্গলের কারণই হয়েছে, সন্দেহ নেই। দেশে থাকলে এ কন্যা তো এতদিনে পরম-ভট্টারক মহীপালদেবেরই ভোগ্যা হতো। সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারলে রাজপ্রসাদ হয়তো মস্তকে ধারণ করবার অধিকার পেতে, কিন্তু অনাঘ্রাত কুমারীপুষ্পটিকে লাভ করার আনন্দ—"

রক্তচক্ষু সুরথ গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, "ব্যস! আর না! আর এবিষয়ে একটি কথাও বললে আমি আপনার বয়সের বা সম্পর্কের মর্যাদা কোনটাই রক্ষা করতে সমর্থ হবো না। এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করুন!"

সুরথের দক্ষিণ হস্তের অর্ধমুক্ত তরবারির দিকে অর্ধমুদিত নেত্রের কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিগ্রহদেব আবার একটু হাসিলেন। হস্তস্থিত শাণিত কৃপাণের তীক্ষ্ম ফলকটি মনোযোগ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "ওতে এখনও বিশেষ সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না, সুরথ! এ বৃদ্ধের মুষ্টিতে এখনও যে শক্তি, তোমাদের এ যুগের যুবকদের কারুর তা নেই। তা যাক, তোমার সঙ্গে এতদিন পর প্রথম সাক্ষাতেই একটা কলহ বাধাতে আমি চাইনে। আমি তো আর সুনন্দা দেবীর পাণিপ্রার্থী নই! এখন তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি কি ঠিক করেছ, সেটাই বরঞ্চ আমাকে বল!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরথ উত্তর করিল, "চার বৎসব আগেই তো এবিষয়ে আমার মত আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি! এতদিন পবে আবার এ প্রশ্ন কেন?"

—"তোমার সেই বিরাট মহামানবতার আদর্শ আর যত রাজ্যের দার্শনিক তত্ত্বের আজগুবি কল্পনা যে এখনও তোমার মাথায় ভর ক'রে আছে, আমি কেমন করে সে কথা জানব? মনে করেছিলাম যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ, সম্পদ, যশ, মান—এগুলি যে জীবনে বড় তুচ্ছ বস্তু নয়, সেটা

বুঝবার মত ক্ষমতা তোমার হয়েছে। সে যাক, কিন্তু তোমার এই কথাই তাহলে স্থির তো? তোমার পিতার সম্পত্তির কোন অংশের উপরেই তুমি আর কোন দিন দাবী করবে না?"

সুরথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "কোনদিন না। আমাকে যদি দরিদ্রতম কৃষকের ক্ষেত্রে হীনতম শ্রমিকরূপেও জীবিকা উপার্জন ক'রে দিন অতিবাহিত করতে হয়, তবু একমুষ্টি অন্নের জন্যও আমি পিতৃপিতামহের যে সম্পত্তি শুদ্ধ অন্যায় আর অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার প্রত্যাশী হব না। শুধু পিতার সম্পত্তি কেন, আমি তো আপনার বিস্তৃত ভূসম্পত্তিরও একমাত্র উত্তরাধিকারী, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, সে দুর্ভাগ্য হতেও আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন। লক্ষ লক্ষ প্রজার বুকের রক্ত শোষণ করে যে সম্পদ ও গৌরব দিনের পর দিন বর্ধিত হয়ে উঠেছে, তার অধিকার লাভ করার অভিশাপ আমাকে যেন আর অনুসরণ না করে।"

বিগ্রহদেবের মুখ কুটিল হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নিজহস্তের সুবৃহৎ হীরকাঙ্গুরীয়টি চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "সম্পদ তাহলে তোমার কাছে দুর্ভাগ্য?—আর এত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করাটা অভিশাপ? মন্দ নয়! কিন্তু এই অদ্ভুত ধারণাটা তোমার মনে জন্মালো কি ক'রে?"

—"জন্মানোটা আশ্চর্য নয়। গত দেড়শত বৎসর ধরে গৌড়বঙ্গে মহানায়ক সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের গৌরব যেমন দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, প্রজাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ও নিষ্ঠুরতার পরিমাণও তেমনই ক্রমশঃ বর্ধিতাকারে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও অত্যাচার আর রক্তশোষণের জন্য আমাদের বংশের যতটা খ্যাতি, তেমন বোধ হয় আর কোন বংশেরই নেই। রাঢ়ে ও বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিটি ক্ষুদ্রতম গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যেও বোধ হয় এমন কেউ নেই, যে দুর্দ্ধর্ষ জমীদার বলে আমাদের না চেনে। আজ আপনি বা আমি এই পথের পাশে যে কোন গৃহস্থের কুটিরে গিয়ে দাঁড়াই, আমাদের পরিচয় জানলে তারা ভয়ে শিউরে উঠে সে স্থান ত্যাগ ক'রে পলায়ন করবে। শিশু মায়ের বুকে আমাদের নাম শুনে ভয়ে আঁৎকে ওঠে, স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে স্ত্রী শান্তি পায় না। সাতদিন উপবাসের পর একমুষ্টি অন্ন নিয়ে আহার করতে বসে যদি কোন হতভাগ্য কৃষক আমাদের নাম শুনতে পায়, তবে পাছে আমাদের কর্মচারী

গিয়ে কর আদায়ের নাম ক'রে তার মুখের গ্রাস কেড়ে আনে, এই ভয়ে সে সেই সামান্য খাদ্য লুকিয়ে ফেলবার জন্যই অস্থির হয়ে ওঠে! যত গ্রামে আমাদের অধিকার, তার কোথাও সম্পদ দূরে থাক—স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষীণতম চিহ্নও দেখা যায় না। গৃহস্থ তার ঘরে আচ্ছাদন দিতে সাহস পায় না—পাছে তার হাতে যথেষ্ট অর্থ জমেছে মনে করে আমরা তার দুর্বহ করের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিই। স্ত্রীকন্যার পরিধানের বস্ত্র শতজীর্ণ হয়ে গেলেও একখানা নূতন কাপড় তাদের হাতে তুলে দিতে সাহস করে না, পাছে জমীদারের লোক গিয়ে অনাদায়ী খাজনার হিসাবে জমা করে নিতে সেখানাও কেড়ে নিয়ে যায়! এ যদি না অভিশাপ হয়, তবে অভিশাপ আর কাকে বলব? এ যদি দুর্ভাগ্য না হয়, তবে জগতে দুর্ভাগ্য কি?"

বিগ্রহদেব প্রশান্তমুখে বলিলেন, "ভূ-স্বামীর পক্ষে প্রজার এই ভীতি তাঁর শাসন-ক্ষমতার পরিচায়ক—সুতরাং অতিশয় গৌরবের বস্তু, লজ্জার নয়।"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে সুরথ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু কোন্ অধিকারে আমরা শত শত দুর্ভাগা মানুষের ওপরে এই অত্যাচার করবার ক্ষমতা লাভ করেছি? ভূ-স্বামীর কর্তব্য কি কেবল প্রজার নিকট থেকে ছলে, বলে, কৌশলে অর্থ-সংগ্রহ,—প্রজাপালন নয়? নিজেদের স্বার্থের জন্য এই সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন এমন দুর্বিষহ করে তুলে পরলোকে গিয়ে কেমন করে এর জবাবদিহি করব?"

অবিচলিত মুখে বিগ্রহদেব বলিলেন, "কিসের জবাবদিহি? বিধাতা আমাদের যে ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন, তা-ই আমরা ভোগ করছি, এর মধ্যে অন্যায় কি আছে? অনুতাপের কারণই বা কোথায়?"

তখন প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমুদীতে চারিদিকের প্রান্তরভূমি আদিক্‌চক্রবাল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সেদিকে চাহিয়া বিগ্রহদেব ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "উচ্চ-নীচে প্রভেদ বিধাতার সৃষ্টি—মানুষের কর্মফল যাকে যে শ্রেণীতে জন্ম দেয়, সেই অনুযায়ী ফল সে ভোগ করে। আমার কর্মফল যদি আমাকে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠবংশে জন্মদান ক'রে থাকে, অপরের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে জীবন উপভোগের এ সুযোগ আমি কেন ব্যর্থ করব? আমাদের মত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন ক'রে দেবার জন্যই কেবল বিধাতা যাদের সৃষ্টি করেছেন, আমি যদি তাদের

হাত থেকে সুখের উপকরণ গ্রহণ না করি, অপরে করবে। তাই যদি হয়, তবে নিজেকে আমি কেন বঞ্চিত করব, বল দেখি? শাস্ত্রে আছে, শূদ্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দাস—বৈশ্য তার সহায়ক। তাই আমরা বর্ণের শ্রেষ্ঠ, আর এরা সমাজের ইতর শ্রেণী। আমরা বাহুবলে দেশ দেশান্তর জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলি, ইন্দ্রের মত সগৌরবে কুবেরের সম্পদ কেড়ে নিয়ে এসে অবহেলাভরে তাই ভোগ করি—আমাদের সঙ্গে এদের কিসের তুলনা? এরা অকর্মণ্য, এরা দুর্বল, আমাদের ছাড়া এদের একটি দিনও চলে না। আমাদের যখন প্রয়োজন হবে, তখন সে অভাব দূর করবার জন্য এরা ক্ষেত্র কর্ষণ করে শস্য যোগাবে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে আমাদের আরামের উপকরণ সজ্জিত ক'রে রাখবে—এছাড়া এদের জীবনের সার্থকতা কোথায়?"

তীব্র শ্লেষযুক্ত স্বরে সুরথ বলিয়া উঠিল—"আর ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য সমস্ত চিন্তা বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবল ভূস্বামীর সেবা করবে! চমৎকার সামাজিক নীতি! মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ!"

অর্ধনিমীলিত চক্ষে বিগ্রহদেব উত্তর দিলেন, "তাতে ক্ষতিই বা কি? প্রজার কাছে ভূস্বামীই দেবতা, তাঁর সেবাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম! প্রজার দেহ-মন-আত্মার ওপরে ভূস্বামীরই তো চরম অধিকার!"

দুই হাত শূন্যে তুলিয়া সুরথ বলিয়া উঠিল, "রক্ষা করুন! আপনাদের ঐ অমানুষিক ভোগধর্মের বিবৃতিতে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে! আমাকে আপনারা বিস্মৃত হোন, আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ বংশতালিকা থেকে আমার নাম নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাক। আমি এই গ্লানিকর আবহাওয়া থেকে মুক্তিলাভ করে উন্মুক্ত সূর্যালোকে, সহজ জীবনে, মানুষের সঙ্গে একত্র হয়ে মানুষের মাঝে ফিরে যাই। গৌড় বা সপ্তগ্রামের সুরম্য অট্টালিকা, পিতৃপিতামহের অর্জিত অতুল কীর্তি ও বৈভব—কিছুর প্রতি আমার লোভ নেই। আপনি সমস্ত গ্রহণ করুন, আমাকে শুধু জীবন থেকে এই নিদারুণ অভিশাপ মুছে ফেলে নূতন করে আমার পথ বেছে নিতে দিন।"

"আর সেই নূতন যাত্রা-পথে তোমার সঙ্গিনী হবেন শ্রেষ্ঠীকন্যা সুন্দরী সুনন্দা দেবী—এই তো?"

দন্তে দন্ত চাপিয়া সুরথ উত্তর দিল, "সে সৌভাগ্য লাভ করবার

অধিকার আমার হবে কিনা, সে কথা বলতে পারি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, আমি যদি কোন নারীকে কখনও আমার জীবনে পত্নীরূপে গ্রহণ করি, তবে আমার পিতৃবংশের পাপের ফল যাতে আমার সন্তানদের ভোগ করতে না হয়, সে জন্য যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করেই করব। জানি না, আমার জীবন দিয়েও এই সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা। কিন্তু নিজেকে নির্মল করে তুলতে আমার দিক দিয়ে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।"

বিগ্রহদেব হাসিয়া বলিলেন, "এই প্রায়শ্চিত্ত যদি তুমি আপাততঃ সম্পত্তিত্যাগ দিয়েই আরম্ভ করতে চাও, তবে আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আমি বরঞ্চ এ ব্যবস্থায় বেশ একটু খুসীই হব। সম্প্রতি আমার যা বার্ষিক আয় তাতে আমার আর ঠিক কুলিয়ে উঠছে না—প্রায়ই টানাটানির দায়ে সম্পত্তির কোন না কোন অংশ বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। তোমার নিজস্ব বিষয় থেকে কিছু আমাকে আপাততঃ উপভোগ করতে ছেড়ে দিতে পারো কি না, সে কথা আলোচনা করতেই প্রধানতঃ তোমাকে আজ ডেকেছিলাম। তা তুমি যদি স্বত্বত্যাগ করে সবটাই আমাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে থাকো, তাহলে তো গোল চুকেই যায়।"

নির্নিমেষ নেত্রে কিছুক্ষণ পিতৃব্যের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুরথ বলিল, "তাই দেব। আমার বিষয় বলে সে সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার যাতে আর কোন উপায় না থাকে, এমন ভাবেই তাম্রপট্টে স্বত্ব ত্যাগের দলিল করে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি ভোগে কি আপনাদের ক্লান্তি কখনও আসে না? ঋণের দায়ে সম্পত্তি বাঁধা পড়ে গেছে, তবু আপনাদের চৈতন্য নেই। এর চেয়ে বাহুল্য ব্যয়গুলো ত্যাগ করলে তো আপনার পক্ষে অনেক বেশী সুবিধা হতো!"

গর্বিত, স্থির-দৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চাহিয়া বিগ্রহদেব বলিলেন, "আমরা পালসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মহানায়কবংশ—ত্যাগে আমাদের অগৌরব আছে, ভোগে নেই!"

একথা শুনিয়া সুরথ নীরব হইয়া রহিল। বিগ্রহদেব পুনরায় বলিলেন, "তুমি যে সাম্যের আদর্শ, ত্যাগের মহত্ত্ব, এবং সাধারণ জীবন-যাপন করার গৌরবের কথা এযাবৎ আমায় শুনিয়ে এসেছে, তা ক্ষাত্রধর্ম নয়, শক্তিহীন দুর্বলের ধর্ম। যে সামাজিক নীতি আমাদের এই অভিজাত

সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে, আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা ও সমর্থন করি —তোমার সঙ্গে আমার মত কোন দিনই মিলবে না। পাছে তুমি তোমার নূতন মত প্রচার করতে গিয়ে সমাজের কিছু অহিত ঘটাও বা বংশের নামে কলঙ্ক লেপন কর, এজন্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছিলাম। মহারাজ শ্রীমৎ মহীপালদেব তখন আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই তুমি গৌড়ে থাকতে থাকতে আমি সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারিনি। উজ্জয়িনীতেও তোমার ভাগ্য তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। যাক, তোমার মত যতদিন তুমি নিজের মনে সীমাবদ্ধ রাখবে, ততদিন তোমাকে আমার আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এই ধারণা যদি তুমি জনসমাজে প্রচার করতে চেষ্টা কর, তাহলে আমার হাত থেকে তোমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার সম্পত্তি তুমি আমাকে লিখে দাও ভাল, না দিলেও আজ থেকে সম্পূর্ণ বিষয় আমিই ভোগ করব। তোমার মত হীনবলের এ ভারত-বিশ্রুত বৈভবে বিন্দুমাত্র অধিকার নেই—এর ওপর একমাত্র ন্যায্য অধিকার আমার। নিয়তি তোমাকে যে পথে টেনে নিয়ে যায়, তুমি সেই পথে যাও, আমার পথে আমি চলি। তোমাতে আমাতে এই শেষ সাক্ষাৎ।"

সহসা নত হইয়া বিগ্রহদেব অশ্বের পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাত করিলেন। উচ্চকিত অশ্ব সবেগে গ্রীবা উৎক্ষিপ্ত করিয়া উল্কার মত দেখিতে দেখিতে আরোহীকে লইয়া দৃষ্টির অন্তরালে বাহির হইয়া গেল। নির্জন প্রান্তরে বহুক্ষণ পর্যন্ত অশ্বক্ষুরধ্বনি কাণে বাজিতে লাগিল। ধূলা উড়িতে লাগিল, বাতাস ক্রমে আরও বেগে বহিল, অকস্মাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণী বায়ু হা হা শব্দে দিক দিগন্ত কাঁপাইয়া সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল। সুরথ বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন্ অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল. সেকথা সে নিজেও জানিত না।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

রুদ্ধদ্বার গৃহে বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া সুনন্দা ভাবিতেছিল, "কই, তিনি তো আজ এখনও এলেন না!"

আজ প্রায় একমাস হইল, সুরথ অবন্তী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যাত্রার দিন সন্ধ্যাবেলা উমাপতির নিকটে সে যখন বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল, সুনন্দা তখন তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিল। ভক্তিভরে উমাপতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলো মাথায় তুলিয়া লইতে লইতে সে একবার চকিত কটাক্ষে সুনন্দার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "বিশেষ প্রয়োজনে আজ আমাকে একবার দেশে যেতে হচ্ছে। সম্ভবতঃ আগামী শুক্লাষ্টমী তিথিতে আমি আবার উজ্জয়িনীতে ফিরে আসব। আপনাদের সাহচর্যে গত ছয় মাস সন্ধ্যাগুলি বড় অনন্দে কেটেছে। আশা করি, আবার যেদিন ফিরে আসব, সেদিনই আপনাদের দর্শন লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হবে।" তাহার কথাগুলি যে শেষের দিকে একটা অপূর্ব মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সুনন্দার লক্ষ্য এড়ায় নাই। সেই দৃষ্টিটুকু এবং কথার ভঙ্গীটি সুনন্দা সযত্নে আপনার মনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। গভীর রাত্রে শয়নকক্ষের বাতায়নের পার্শ্বে বসিয়া এই অমূল্য সম্পদগুলি নিজের মনে নিজে নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া সে পুলকে, লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিত। দিনের পর দিন ক্ষণকালের সাক্ষাতে সুরথ কেমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছে, কখন্ কোন্ কথাটি বলিয়া নিজের মনের ভাব তাহার নিকটে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সহসা আরক্ত হইয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে, সুনন্দা কেবল মুদিতনেত্রে তন্ময় হইয়া এই সময় তাহাই চিন্তা করিত। এই সুমিষ্ট চিন্তা হইতে যে প্রীতির অমৃত ক্ষরিত হইত, তাহার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার বাহ্যজ্ঞান হইতে যেন সমস্ত জগৎ মুছিয়া যাইত। তাহার মুদিত চক্ষুর সম্মুখে কেবল সুরথের প্রশান্ত সুন্দর মুখ ভাসিতে থাকিত, দুই কাণ

ভরিয়া সে কেবল তাহারই মধুর কণ্ঠ শুনিত। স্মৃতি ও কল্পনার বিলাসে বহুক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়া অবশেষে সে যখন ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করিত, তখনও প্রথম স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় তাহার একান্ত প্রেমাস্পদের নিকট ছুটিয়া যাইত। বাস্তব জগতে সাক্ষাৎ হইলে এই দুটি প্রেমমুগ্ধ তরুণ হৃদয় যে কথা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিবার কল্পনাও করিতে পারিত না, স্বপ্নজগতে তাহাই কেবল অবিরত তাহাদের অনুসরণ করিয়া ফিরিত।

প্রথম প্রেমের মধুর দিনগুলি কি আনন্দে সুনন্দার কাটিতেছিল! কি অনাস্বাদিত মাধুর্যে, কি অপরিসীম গাম্ভীর্যে, কি শিশুসুলভ সরলতায় তাহার হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! প্রতিদানের আশা তখনও জাগে নাই, তাই নৈরাশ্যের বেদনা ছিল না। তখন কেবল প্রণয়াস্পদকে একবার দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিবার আকাঙ্খা—একটিবার তাহার কণ্ঠস্বর কাণ পাতিয়া শুনিতে অসীম আগ্রহ। সুরথ যেদিন একটু শীঘ্র আসিত, সুনন্দার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত! সে আনন্দ গোপন করিতে গিয়া তাহার মুখে মুহুর্মুহু যে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিত, মুগ্ধ সুরথ তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিত, এমন স্বর্গীয় শোভা জীবনে সে আর কখনও দেখে নাই। একদিন আসিতে বিলম্ব হইলে সুরথ আপনার অজ্ঞাতসারে দৃষ্টিতে যে ক্ষমা-প্রার্থনা ভরিয়া তাহার দিকে চাহিত, তাহাতে সুনন্দার মনে হইত, কি এক অপূর্ব সম্পদ লাভ করিয়া তাহার দিনটি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে! সেদিন সুনন্দার কণ্ঠে সঙ্গীত যেন আরও মধুর হইয়া ধরা দিত। তাহার হৃদয়ের আনন্দ গানের সুরের মধ্য দিয়া উপচিয়া পড়িত। উত্তাপহীন, আসক্তিহীন, অধিকার-বোধশূন্য তাহাদের এই অর্ধব্যক্ত প্রণয়ের দিনগুলি লঘুপক্ষ হংসবলাকার মত লীলায়িত গতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল।

সুরথ বিদায় লইয়া যাইবার পরে আজ আবার সুনন্দার বহু-প্রতীক্ষিত সেই শুক্লাষ্টমী তিথি ফিরিয়া আসিয়াছে। অষ্টমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় সুনন্দার উদ্যান, গৃহ, বাতায়ন উজ্জ্বল। আজ বৈকালে কি ভাবিয়া সুনন্দা সুগন্ধি কস্তুরী-সুবাসিত শীতল জলে তনু দেহটি বহুযত্নে মার্জিত করিয়া একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়াছে—তাহার স্বভাবসুন্দর গাম্ভীর্যের মধ্যে ঈষৎ বিলাসের বিভ্রম আনিয়া কপোলে রচনা করিয়াছে চন্দনের পত্রলেখা। মনে মনে কি আশা করিয়া সে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর

তাহাদের এই প্রথম সাক্ষাতের জন্য আপনাকে এমন করিয়া সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সে স্পষ্ট করিয়া নিজেও জানিত না। কিন্তু যখন বৈকালের সূর্যালোক প্রথমে পীত, পরে আরক্ত এবং অবশেষে মলিন হইয়া আসন্ন রজনীর ছায়ায় ক্রমে মিলাইয়া গেল, তবুও সুরথের দেখা মিলিল না, তখন সে অনুভব করিল, তাহার সমস্ত দিনটিই যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রেমের আনন্দের সঙ্গে প্রথম না পাওয়ার বেদনা মিশিল। তরুণী সুনন্দা অনিন্দ্য প্রেমের পুষ্পে দুঃসহ কণ্টকের ব্যথাজড়িত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

আলোকস্নিগ্ধ আকাশের গায়ে নিঃশব্দে শুভ্র মণিখণ্ডের ন্যায় দু-একটি তারা ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সুনন্দা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাতায়নের নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার পিতার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিল। আজ উমাপতি গৌরীপতির সঙ্গে শিপ্রার বুকে নৌবিহারে গিয়াছেন, ফিরিতে তাঁহাদের যথেষ্ট রাত্রি হইবে—গৃহকর্মের কোন ব্যস্ততা আজ আর নাই। এই অবসরে সুনন্দা পিতার বহুযত্নের গ্রন্থগুলিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। তাহার হস্ত দুইটি কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও মন তাহার ব্যাকুল হইয়া দূরে দূরান্তরে গৌড়ের পথে ছুটিয়া গেল—যে পথ ধরিয়া তাহার প্রিয় হয়তো এমনই আগ্রহভরে দীর্ঘ একমাস পরে তাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কি যেন অচিন্ত্যপূর্ব বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই!

সুনন্দা কতক্ষণ এভাবে কাজ করিয়াছিল সে জানে না, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুর ধ্যানে ডুবিয়া গিয়া প্রাঙ্গনে অশ্বপদশব্দ সে শুনিতে পায় নাই। সহসা চিরবাঞ্ছিত প্রিয়কণ্ঠে গভীর আগ্রহভরে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া দ্রুতপদে কক্ষদ্বারে গিয়া সুরথকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দে, আবেগে, বিস্ময়ে সে যেন বাক্যহারা হইয়া গেল। কই, আর কোনও দিন তো সুরথ এমন করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকে নাই! কখনও তো এমন করিয়া তাহার সহিত নির্জন সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আসে নাই! কিন্তু সুরথ তাহাকে ভাল করিয়া বিস্মিত হইতেও অবসর দিল না। পথশ্রমে ক্লান্ত, ধূলায় ধূসরিত মুখ সুনন্দার দিকে তুলিয়া মিনতিপূর্ণ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "সুনন্দা, আজ তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে, তুমি একটু দয়া করে তা শুনবে কি?"

সুনন্দা কোন কথা কহিল না। দুইটি প্রীতি-প্রফুল্ল, লজ্জারুণ নয়নের দৃষ্টি সুরথের মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার স্নিগ্ধ আঁখি দুইটি যেন বলিতেছিল, 'তোমার কথা শুনিব বলিয়াই তো আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছি! তবে আর এ প্রশ্ন কেন?'

তাহার সরল অন্তঃকরণটিকে দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে দেখিয়া সুরথ যেন আপনার হৃদয়ে সাহস ও বল খুঁজিয়া পাইল। অপেক্ষাকৃত স্থৈর্যের সঙ্গে সে বলিতে লাগিল, "সুনন্দা, তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি! কোনদিন মুখ ফুটে সেকথা তোমাকে আমি বলতে পারিনি, কিন্তু সেজন্য আমার হৃদয়ের এ গোপন কথাটি তোমার কাছে প্রকাশিত হতে কোন বাধা হয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না। তুমি জানো সুনন্দা, আমার জীবনে তোমাকে আমি কেমন করে চাই। সুন্দর ভাষায় মনের আগ্রহ সাজিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু জানি, আমার জীবন তোমাকে ছাড়া নিরর্থক—সুনন্দা, তুমি নিজেও কি সে কথা জানো না?"

সুরথের ব্যাকুলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তিতে সমস্ত গৃহটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই স্পষ্ট প্রেম নিবেদন সহিতে না পারিয়াই যেন সুনন্দার মুখের সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া গিয়া বিপুল আবেগে তাহার হৃদয়ে যাইয়া লুকাইল। পরমুহূর্তে নিজেদের এই কুণ্ঠায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া তাহার দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা প্রিয়ের মুখে চিরপ্রিয় কথাগুলি ভাল করিয়া শুনিয়া লইতে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ছুটিয়া আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার আরক্ত, ভাবাবেগে কম্পিত মূর্তিটির দিকে চাহিয়া গভীর আগ্রহে আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া সুরথ বলিতে লাগিল, "যে আশা মনে পোষণ করবার সাহসও অমার কোনদিন ছিল না সুনন্দা, পথের ভিখারীকে সে সাহস তুমি দিয়েছ। তবু যে এতদিন, এত ভালবেসেও আমার আকুল আকাঙ্ক্ষার কথা একটি দিনের জন্যও তোমায় বলিনি, তার খুব বড় একটা কারণ এতদিন বর্তমান ছিল। আজ সে কারণ অনেকটাই আমার জীবন থেকে ধুয়ে মুছে গিয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে ভূতের বোঝা এই দীর্ঘকাল আমি বহন করে বেড়িয়েছি, তার হাত থেকে এতদিনে আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি।

তাই আজ মুক্তির সংবাদ বহন করে সর্বপ্রথমে তোমার কাছে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ধন ভিক্ষা করতে ছুটে এসেছি—সুনন্দা, তুমি আমার হবে কি?"

সুনন্দার দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না। সুখে না লজ্জায়, ভয়ে না বিস্ময়ে, তাহার অন্তঃকরণ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। অর্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় বিবশ দেহে নিকটবর্তী স্তম্ভপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া নতনেত্রে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা-মুকুলিতাক্ষীর সেই অপরূপ সৌন্দর্য সুরথের মন যেন আরও উন্মাদ করিয়া তুলিল। কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের সকল কোমলতা ঢালিয়া দিয়া মুগ্ধ প্রেমিক বলিতে লাগিল, "আমার দীর্ঘকাল নীরবতায় কি রাগ করেছ সুনন্দা? সব অভিমান আজ ভুলে যাও দেবী, কোন দুঃখ মনে রেখে আজ আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি তো জানো না সুনন্দা, তোমাকে আমার কত প্রয়োজন! তুমি আমার অন্ধকার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র আলো! কেবল তোমার স্পর্শে আমার এ অভিশপ্ত জন্মের গ্লানি দূর হয়ে শান্তি ও তৃপ্তি আমার নিকটে ধরা দিতে পারে! না, না, অমন করে চমকে উঠো না! তোমার কাছে অপরিচিত বিদেশীমাত্র হলেও নাম বা পরিচয়হীন পথের ভিখারী আমি নই। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ জন্মগত অধিকারে পালসাম্রাজ্যের এক সুপ্রসিদ্ধ মহানায়ক-বংশের আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলাম। আমি জানি, মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারকে তুমি কত ঘৃণা কর! উৎপীড়িত মানুষের প্রতি তোমার কোমল হৃদয়ের কত দয়া! তাই অন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সে বিশাল সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে তারপর তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। সুনন্দা, আজ আমার জীবনের সুখের কি দুঃখের দিন, আমি জানি না। পিতৃপিতামহের হৃদয়-হীনতায়, সমাজের নিষ্করুণ ব্যবহারে আমার মন বড় শ্রান্ত। সুনন্দা! তোমার কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধতা নিয়ে আমার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে, আমার সহধর্মিণীরূপে আমার পাশে এসে দাঁড়াও! তোমার স্নেহস্বর্গের পবিত্রতায় আমার ক্ষত হৃদয় জুড়িয়ে নিতে দাও! আজ আর লজ্জা করে থেকো না সুনন্দা, একটি কথা বলে আমার সংশয় দূর কর। বল, আমি মিথ্যে আশা করিনি? তোমার হৃদয় আমারই?"

পেলবপুষ্পের মত সুকোমল, রক্তগোলাপের মত অনুরাগ-রঞ্জিত, একটি সুরভিত, সুমিষ্ট চাহনির স্পর্শ সুরথের মুখের উপর দ্রুত বুলাইয়া সুনন্দা সহসা দুইহাতে মুখ ঢাকিল। সেই ক্ষণিকের দৃষ্টিপাতে সুনন্দার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৃষ্ণতারকায় প্রচুর অনুরাগ-চিহ্ন দেখিতে পাইয়া সুরথের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রেম-পূর্ণ, একাগ্র দৃষ্টিতে প্রিয়তমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে সে বলিল, "আজ তবে যাই সুনন্দা? পৃথিবীতে আর আমার চাইবার মত কিছুই বড় রইল না—কেবল তোমাকে শাস্ত্রমতে আমার বলে দাবী করার অধিকার যেদিন লাভ করব, সেদিন আমার সকল চাওয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষাই তাহলে এখন থেকে প্রতি দণ্ডে, পলে, অনুপলে করব সুনন্দা! কিন্তু অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, এখন তবে আসি?"

সুরথকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া সুনন্দা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কোন মতে বলিয়া ফেলিল, "বাবা—কিন্তু বাবা—এখনই ফিরে আসবেন, আপনি আর অল্প একটু অপেক্ষা করবেন না?"

দ্বারের নিকটে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ কৌতুকে সুরথ মৃদু মৃদু হাসিল। তাহার পর একটু নিম্নস্বরে বলিল, "তুমি বুঝি ভেবেছ সুনন্দা, মহাশ্রেষ্ঠীর অনুমতি না নিয়েই আমি এভাবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম? তা নয়, গৌড় যাত্রা করবার পূর্বেই আমি এ বিষয়ে তাঁর আদেশ প্রার্থনা করে সমস্ত কথা খুলে তাঁকে একখানা পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তর তিনি কি দিয়েছিলেন, এই দেখ।"

এক পদ অগ্রসর হইয়া সে সুনন্দার চোখের সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র পত্র মেলিয়া ধরিল! সুনন্দা চাহিয়া দেখিল, তাহার পিতার হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে:

"সুনন্দার বিষয়ে তুমি যাহা লিখিয়াছ, দেখিলাম। সুনন্দা যদি ভাল-বাসিয়া তোমাকে বরণ করে, তবে আমার হৃদয় কোন কারণেই তোমাকে সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমার কন্যার সুখ আমার নিকটে পৃথিবীর অন্যান্য সকল বস্তুর চেয়ে অনেক বড়। সে যদি তোমাকে চাহিত, তবে আমার সমস্ত ধর্ম, সংস্কার অথবা প্রবৃত্তি তোমার বিরুদ্ধে হইলেও তাহার মুখ চাহিয়া সকল ভুলিয়া আমি তোমাকে স্নেহ করিতাম।

তুমি তাহার হৃদয় বুঝিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। তোমার প্রকৃত পরিচয় তুমি আমার নিকটে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছ, কিন্তু এখন তাহার কোন প্রয়োজন নাই। আমার কন্যা যদি তোমাকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিবাহের পরদিন তুমি সকল কথা আমাকে খুলিয়া বলিও। আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ গ্রহণ কর। ইতি নিত্যশুভাকাঙ্খী শ্রীউমাপতি শ্রেষ্ঠী।"

পড়িতে পড়িতে পিতার অতুলনীয় স্নেহের এই প্রকাশে সুনন্দার ইন্দীবর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনুরাগবিহ্বল নেত্রে সেদিকে চাহিয়া সুরথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এইবার নিশ্চিন্ত হলে তো? এখন তাহলে তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি এবার যাই। কাল বিকালে আমি আসব, এর মধ্যে সম্ভব হলে মহাশ্রেষ্ঠীকে সব কথা তুমি বলে রেখো। কেমন, পারবে না?" হাসিভরা উজ্জ্বলমুখ তাহার দিকে ফিরাইয়া সুরথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সুনন্দা সেই একই ভাবে ক্ষণপূর্বের মুহূর্তগুলিকে স্মৃতির সম্মুখে লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে উমাপতি গৃহে প্রবেশ করিয়া আনন্দ-তরল কণ্ঠে ডাকিলেন, "সুনন্দা, মা!" "বাবা" বলিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে গিয়া সুনন্দা হঠাৎ তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিস্মিত, সন্ত্রস্ত উমাপতি চমকিত হইয়া কন্যার মুখ তুলিয়া ধরিয়া প্রদীপের আলোতে দেখিতে পাইলেন, সার্থকতার আনন্দ অশ্রু হইয়া তাহার নেত্র বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। একটুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে কে এসেছিল সুনন্দা? সুরথ কি?" মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সুনন্দা বিপুল উচ্ছ্বাসে পুনরায় পিতার স্নেহকোমল বক্ষে মুখ লুকাইল। উমাপতি নীরবে তাহাকে বাহুর আশ্রয়ে ধারণ করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। সুনন্দা মুদিত নেত্রে পিতার স্নেহস্পর্শটুকু অনুভব করিতে-ছিল। আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদ-শঙ্কাতুর পিতৃহৃদয়ের শূন্যতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাহার ছিল না। জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণটিতে দাঁড়াইয়া তাহার অম্লান, শুভ্র হৃদয়ের আনন্দ ও তৃপ্তি চোখের জলের মধ্য দিয়া ঝরিয়া পড়িয়া উমাপতির স্কন্ধের উত্তরীয় সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার মুখের আকস্মিক পাণ্ডুরতা ও হতাশার কাঠিন্য সুনন্দার চোখে পড়িল না।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

"সুনন্দা,

সকালবেলা উঠেই আজ তোমার কাছে এই চিঠি লিখতে বসেছি। ঘুম ভেঙে তুমি যখন বাইরে এসে দাঁড়াবে, তখন আমার নিজের হাতে গাঁথা গন্ধভরা শাদা গন্ধরাজের মালায় জড়ানো চিঠিটি তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে তোমার চোখ দু'টি আনন্দের আভায় কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, মনে মনে সে ছবি কল্পনা করে আমার হৃদয় সুখে, সৌভাগ্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সুনন্দা, সমস্ত পৃথিবীতে আজ আমার মত সুখী কে? কাল রাত্রে তোমার পিতার আশীর্বাদ লাভ করে আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে নির্জন রাজ-পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলুম—আর মাত্র একটি সপ্তাহ, তারপরেই তুমি আমার হবে! আমার গৃহে, আমার হৃদয়ে, তোমাকে আমি একান্ত করে পাব। এ চিন্তার যে কি তীব্র আনন্দ-মদিরা, তুমি কি তা একটুও অনুভব করতে পারো, সুনন্দা? আমার দিবারাত্রির অন্য সকল ভাবনা তুমি হরণ করে নিয়েছ। কবে তুমি আমার গৃহে আসবে, তোমাকে বরণ করে নিতে এ ঘর কেমন করে সাজিয়ে তুলব, কেবল এই কল্পনাতেই আমার চিত্ত তন্ময় হয়ে ডুবে থাকে। তোমার হৃদয়ও কি আমার জন্য এমনি ব্যাকুল হয়, সুনন্দা?

সুনন্দা, সুনন্দা, সুনন্দা আমার, কি মধুর নামটি তোমার প্রিয়া! মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে মনে মনে তোমার নামটি উচ্চারণ করি, আমার শিরায় শিরায় যেন আনন্দের বিদ্যুৎ চঞ্চল হয়ে ছুটে যায়, তোমার মাধুর্যে আমার হৃদয় নিমেষে নিমেষে উচ্ছল হয়ে ওঠে। আজ প্রথম তোমাকে এ-কথাটি বলছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের পরমুহূর্ত হতে গত কয়টি বৎসর অনবরত এই কথাই ভেবেছি—ভবিষ্যতে লক্ষ কোটি জন্ম ভরে এই কথাটি ভাবব প্রিয়া! আমার জীবনে মূর্তিমতী আনন্দ তুমি, আমার স্বপ্ন, আমার স্বর্গ, আমার সাধনা, আরাধনা তুমি—আমার কাছে তোমার মূল্য কেমন করে বোঝাব আমি? আমার মনের আকাশে তুমি শান্ত, স্নিগ্ধ ধ্রুবতারা—তোমাকে যদি আমি পাই, তবে তো আমার কোন কামনাই অপূর্ণ থাকবে না!

কাল রাত্রে যখন ফিরে আসি, তখন তোমার ঘরে প্রদীপ জ্বেলে বাতায়নের পাশে তুমি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলে। ঘন কালো চুলের ছায়ায় তোমার ললাট অন্ধকার—দূরের দিকে চেয়ে তখন কি কথাটি ভাবছিলে প্রিয়া? তোমার মনের সেই গোপন কথাটি নিভৃতে শুনবার জন্য আমার হৃদয় উৎসুক হয়ে উঠেছে। আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে হয়তো আমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু সুদীর্ঘ দিবসের এই দীর্ঘ প্রহরগুলি বৃথা কাটিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই আমার প্রেমের এই স্মারক-লিপি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। সন্ধ্যায় যখন তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, তখন যেন তোমার চোখে এর উত্তর পাই"......

উমাপতির পাঠগৃহে গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া সদ্যস্নাতা সুনন্দা সহস্রবার করিয়া চিঠিখানি পড়িতেছিল। তাহার নিকটে সুরথের এই প্রথম প্রণয়লিপি। পত্রের ছত্রে ছত্রে সুরথের যে মুগ্ধ দৃষ্টির স্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুনন্দার হৃদয় সুখে, লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যায় সুরথ আবার আসিবে, একথা মনে করিতে তাহার কপোল দুটিতে ঘনতর লালিমা দেখা দিল। এই সুস্পষ্ট প্রেমের অভিব্যক্তির পর সুনন্দা কেমন করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে?

তখন প্রভাত-সূর্যের রশ্মি হইতে রক্তিমাভা ঘুচিয়া গিয়া শুভ্র উজ্জ্বলতা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুনন্দা চাহিয়া দেখিল, উমাপতি স্নান সমাপ্ত করিয়া তাঁহার পূজার কক্ষটিতে প্রবেশ করিতেছেন। একবার এই সময় তাঁহার নিকট যাইবে মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু পত্রের মধ্য হইতে সুরথের সপ্রেম কণ্ঠ ও সস্নেহ দৃষ্টি দুর্নিবার বেগে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। আর একবার চিঠিখানি পড়িয়া দেখিবার জন্য সে পুনরায় বাতায়নের পার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন সময় একটি দীর্ঘ-দেহের ছায়া চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়াতে সুনন্দা বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, জয়ন্ত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মহাপ্রতীহারের বিচার-কক্ষে সেই সাক্ষাতের পর হইতে সুরথের ন্যায় জয়ন্তও উমাপতির গৃহে নিত্য-অতিথি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে উমাপতি যখন সকলকে লইয়া উদ্যানে গিয়া বসিতেন, তখন জয়ন্তকে প্রায়ই তাঁহার অতি নিকটে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে তাহার বড় একটা স্পৃহা

ছিল না। সুনন্দার সঙ্গে কথা বলিতেও সে কোনদিন চেষ্টা করে নাই। তবু কিসের আকর্ষণে যে সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার করিয়া এই ক্ষুদ্র গৃহখানিতে উপস্থিত হইত, তাহা সে নিজে ছাড়া অপর কেহ জানিত না। যে বঙ্কিম শ্লেষ, তীব্র চাহনি ও তীব্রতর কণ্ঠের জন্য জয়ন্ত উজ্জয়িনীর যুবকসমাজে বিখ্যাত ছিল, উমাপতির নিকটে আসিলে তাহার কোন চিহ্নই আর বর্তমান থাকিত না। কখনও সে নিবিষ্টমনে উমাপতির পদপ্রান্তে বসিয়া গৌরীপতির সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন শুনিত। কখনও বা মৃদু-স্বরে আপনার দেশ দেশান্তরে ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিঃসঙ্গতা দূর করিতে চেষ্টা করিত। উমাপতির নিকটে আসিবার কোন নির্দিষ্ট সময় তাহার ছিল না। কোনদিন সুনন্দার স্বহস্তরোপিত পুষ্প-বৃক্ষগুলির অঙ্গ হইতে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের তাপ মিলাইয়া যাইবার বহু-পূর্বে সে উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইত। পিতাপুত্রী মিলিয়া উদ্যানের পরিচর্যা করিতেন, জয়ন্ত একটু দূরে বকুলবৃক্ষের ছায়ায় প্রস্তরবেদীর উপরে অর্ধশয়ান অবস্থায় অলস দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকিত। কোনদিন বা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে সে নিঃশব্দ চরণে উমাপতির পশ্চাতে আসিয়া বসিয়া সুনন্দার গান শুনিত। শুনিতে শুনিতে সকলের অজ্ঞাতসারে আবার তেমনি নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যাইত। উমাপতি জয়ন্তকে বিশেষ স্নেহ করিতেন বলিয়াই তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে কেহ কোনদিন আপত্তি করে নাই। অত্যন্ত খেয়ালী-প্রকৃতির মানুষ মনে করিয়া তাহার বাহ্য ব্যবহারের ত্রুটিগুলি সকলে মার্জনা করিয়াই চলিত। লোকপরম্পরায় শোনা গিয়াছিল, অর্থসম্পদের জয়ন্তের অভাব নাই, কিন্তু সে যে সমস্ত দিন কি করে, কোথায় থাকে, এ-কথা কেহ ভাল করিয়া জানিত না। উমাপতি-সুনন্দার নিকটেও জয়ন্তের ইতিহাস রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু জয়ন্তের হৃদয়ের একটি গোপন কথা আর কেহ না জানিলেও সুনন্দার জানিতে বিলম্ব হয় নাই। বাহিরে তাহার নিকটে আসিতে চেষ্টা না করিলেও ভিতরে ভিতরে জয়ন্তের মন যে সর্বদা তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিত সুনন্দা তাহা বহুপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছিল। জয়ন্তের চক্ষু যে অনেক দূরে থাকিয়াও প্রতি মুহূর্তে তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফেরে, বহু জনসমাগমের মধ্যেও তাহার হাসিটুকু, কণ্ঠের স্বরটি

সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সে কথা সুনন্দা জানিত। স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির এই যুবকটির এই তন্ময়তা ও তদ্‌গত চিত্তের অনুরাগ সুনন্দার কোমল হৃদয়ে অনুকম্পা ও করুণা উদ্রেক না করিয়া পারে নাই। সুরথের সহিত তাহার যে সাদৃশ্য একদিন সুরথের জীবন-রক্ষার প্রধান হেতু হইয়াছিল, সুনন্দার চিত্তে তাহা জয়ন্তের প্রতি অবিমিশ্র স্নেহ ও সহানুভূতির উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। জয়ন্ত যে সুরথের প্রতি তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কোনদিন তাহার গোপন অনুরাগ সুনন্দার নিকটে ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হয় নাই, সেজন্যও সুনন্দা মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। আজ তাই এমন অসময়ে জয়ন্তকে সহসা তাহার এত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, কয়েকদিন পূর্বে সুরথ এমনই অকস্মাৎ এই গৃহেই তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই অতি সুখকর স্মৃতিতে সুনন্দার সমস্ত চৈতন্য প্লাবিত হইয়া গিয়া গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাসে তাহার আকণ্ঠ ললাট রঞ্জিত হইয়া গেল।

ঈর্ষাকলুষিত নেত্র তুলিয়া জয়ন্ত দেখিতে লাগিল, সুরথের প্রেম যেন মূর্তি গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুনন্দার লাবণ্যময়ী আকৃতি ঘিরিয়া যে সুখ ও সৌভাগ্যের কিরণ ঝলমল করিতেছিল, তাহা সুরথেরই মুগ্ধ হৃদয়ের দান। সুরথের স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য তাহার বিপুল কবরী বেষ্টন করিয়া শুভ্র গ্রীবাটিকে সপ্রেমে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। গত রাত্রে উমাপতি উভয়কে আশীর্বাদ করিবার পর বাগ্‌দানের চিহ্নস্বরূপ যে বহুমূল্য কণ্ঠমালা সুরথ সুনন্দাকে পরাইয়া দিয়াছিল, এখনও সে উজ্জ্বল মণিহার তাহার প্রেমের স্মারকচিহ্নরূপে সুনন্দার কণ্ঠে দুলিতেছে। সুনন্দার আয়তনয়নের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুরথের স্বপ্ন, তাহার মধুর অধরের হাসিতে সুরথের স্মৃতি—কপোলের যে রক্তিম মাধুরী আজ তাহাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও যে সুরথেরই প্রেমনিবেদনের ফল, সেকথা বুঝিতে জয়ন্তের ভুল হইল না। দেখিয়া দেখিয়া জয়ন্তের দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া অশ্রুতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই অনুপম লাবণ্য ও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার আজ যাহার হইতে চলিয়াছে, বাহ্য আকৃতিতে জয়ন্তের সঙ্গে

তাহার কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ইহার দিকে চাহিয়া চক্ষু দুটি জুড়াইয়া লইবার অধিকারও আজ হইতে জয়ন্তের আর রহিল না!

কোন রকমে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সুনন্দাই প্রথমে কথা বলিল—সম্ভ্রমজড়িত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা পূজার ঘরে গিয়েছেন, বাইরে আসতে তাঁর একটু বিলম্ব হতে পারে। আপনি ততক্ষণ তাঁর জন্য এখানেই অপেক্ষা করবেন কি?"

একটু ম্লান হাসিয়া জয়ন্ত বলিল, "তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হলেও চলবে। সেজন্য কোন ব্যস্ততা নেই। আপাততঃ আপনার কাছেই আমার সামান্য একটু প্রয়োজন ছিল।"

সুনন্দা ঈষৎ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া জয়ন্ত ধীরে ধীরে বলিল, "বন্ধু সুরথের নিকটে শুনলাম, আপনাদের উভয়ের জীবন শীঘ্রই মিলিত হতে চলেছে। এ শুভসংবাদে অন্য সকলের মত আমিও অত্যন্ত সুখী। কিন্তু আপনাদের বিবাহোৎসব যখন সম্পন্ন হবে, সম্ভবতঃ আমি তখন উপস্থিত থাকতে পারব না! বিশেষ প্রয়োজনে আজ রাত্রেই আমাকে নগরের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। তাই শুভদিনে যে উপহারটি আপনাকে দেব বলে স্থির করেছিলাম, আজকেই সেটি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে এটির দিকে চেয়ে, বন্ধু বলে আমাকে যদি স্মরণ করেন, তাহলে কৃতার্থ বোধ করব।"

বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে কথাগুলি বলিয়া জয়ন্ত একটি রত্নপেটিকার আবরণ উন্মোচন করিয়া সুনন্দার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। বিস্মিতা সুনন্দার দৃষ্টির সম্মুখে একটি মহামূল্য মণিরত্ন-খচিত কণ্ঠমালা সূর্য-কিরণে জ্বলিয়া উঠিল। অধিকতর বিস্মিতা হইয়া সুনন্দা দেখিল, তাহার কণ্ঠে সুরথের দেওয়া যে রত্নমালা রহিয়াছে, জয়ন্তের উপহার মণিহারটি অবিকল তাহারই অনুরূপ! এক পদ পিছাইয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিল, "একি, এ মালা আপনি আমাকে কেন দিচ্ছেন? এত মূল্যবান উপহার কেন নেব আমি?"

জয়ন্তের অধরে একটি সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। শ্রান্ত কণ্ঠে সে বলিল, "সুনন্দা দেবি, অর্থের আমার কোন অভাব নেই। বিধাতা আর কিছু না দিলেও কুবেরের সম্পদ আমার কাছে দুই হাতে ঢেলে দিয়েছেন।

আমার প্রিয় বন্ধুর মনোনীতা পত্নীকে আমি যদি কিছু দিয়ে সুখী হই, আপনি কেন আপত্তি করবেন?"

সুনন্দার মুখের উপর দিয়া দ্রুত রক্তিমাভা বিদ্যুতের মত চমকিয়া গেল। পরক্ষণে আপনাকে সংযত করিয়া সে যুক্তকরে বলিল, "আপনার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি, তো ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ রত্নহার গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। বন্ধুজনের অকৃত্রিম শুভকামনাই তো শুভদিনে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার! এ রত্নপেটিকা আপনি দয়া করে ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ প্রত্যাখ্যাত কণ্ঠমালাটির দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সুনন্দা দেবি, বিধাতার ইচ্ছায় এ দুটি কণ্ঠহার একই আকৃতিতে গঠিত হয়েছিল! কিন্তু অভিপ্রেত কণ্ঠে শুধু একটিই পৌঁছালো, ভাগ্যবিড়ম্বনায় অপরটি উপহারস্বরূপেও গৃহীত হলো না। ভাগ্যের এ সত্যিই চরম পরিহাস।"

সুনন্দা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া জয়ন্ত পুনরায় বলিতে লাগিল, "বিধাতা কেবল সুরথ ও আমার বাহ্যরূপটাই একরকম করে গড়েননি, পছন্দ অপছন্দটাও অনেকটা এক করে দিয়েছিলেন। তাই সুরথ আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্য যে হারটি করিয়ে এনেছে, সে বিষয়ে কিছু না জেনেও উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ মণিকারের নিকট থেকে ঠিক তেমনি অপর একটি মালাই আমি আপনার জন্য ক্রয় করে এনেছি। এখন দেখছি, যে কণ্ঠে এ রত্নে গ্রথিত সূত্র আমি পরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তা ইতিপূর্বেই অপরের অধিকৃত হয়ে গেছে। বন্ধুর প্রীতি-চিহ্নরূপে এটিকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনাকে উপহার দেবার অধিকারও আমার নেই। যাক, এ নিয়ে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। আমার জন্মনক্ষত্র আমার ভাগ্য এমন করে গড়েছে, আপনি বা সুরথ তার কি করবেন?"

জয়ন্তের কথার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সুনন্দার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। একটু অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি এখনই চলে যাচ্ছেন? বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জয়ন্ত বলিল, "আর অপেক্ষা করে কি করব সুনন্দাদেবী? আমার সব কথা আপনি জানেন না, জানলে আমাকে ফিরে

আসতে আর আহ্বান করতেন না। কিন্তু আজ যখন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার দিন এসেই পড়েছে, তখন আর একটি কথাও আপনাদের কাছে গোপন করব না। আমার প্রকৃত পরিচয় পেলে আপনি হয়তো আমাকে ঘৃণাই করবেন। কিন্তু তবু আমার সব কথা আপনাকে আমি খুলে বলে যাব। বাইরে আর যার কাছে ছদ্মবেশ পরে ঘুরে বেড়াই, আপনার কাছে মিথ্যা আবরণ আমার সহ্য হবে না।"

অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে সহানুভূতি ভরিয়া সুনন্দা বলিল, "আপনি অনর্থক কুণ্ঠিত হচ্ছেন। আপনাকে আমরা সকলেই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু বলে মনে করি, ঘৃণা আপনাকে কেন করব?"

উত্তেজিত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "আপনি তো আমার প্রকৃত পরিচয় জানেন না! জানলে বুঝতে পারতেন, আমাকে ঘৃণা করবার কারণ একটি নয়—অসংখ্য আছে। আমি মাতাল, আমি দুশ্চরিত্র, আমি ভদ্রসমাজের বাইরে—কোন্ অধিকারে আমি আপনাদের বন্ধুত্বের দাবী করব? একদিন কী আমার না ছিল, আর আমার অবহেলায় কী না আমি নষ্ট করেছি? বংশে, বুদ্ধিতে, অর্থে, দৈহিক শক্তিতে সুরথের চেয়ে কোন অংশে আমি হীন ছিলাম না। কিন্তু আমার জীবনের সমস্ত সুযোগ নিয়ে আমি ছিনি-মিনি খেলেছি। তাই আজ আমার ঈপ্সিত রত্ন আমার চোখের সম্মুখে অপরে জয় করে নিয়ে গেলেও সামান্য প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাও আমার নেই!"

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমাকে বঞ্চনা করবার উপায়টি ভাগ্যবিধাতার বড় নিষ্ঠুর! ক্ষমতা ও সুযোগ সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সাধারণ মানুষ যতটা সার্থকতা লাভ করে জীবনে, আমি তা-ও করে উঠতে পারিনি। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন"—বলিতে বলিতে জয়ন্তের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, "মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমার অনন্যসাধারণ শক্তি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, যে আমার ভাগ্য একদিন আমায় কতদূর ব্যর্থতায় নিয়ে পৌঁছে দেবে! চতুষ্পাঠিতে বিদ্যার্থী যারা ছিল, গুরুর চোখে আমার সঙ্গে তাদের তুলনাও চলত না। অস্ত্র-চালনা শিখতে যখন তক্ষশীলায় গিয়েছিলাম, মহানায়ক জগৎসিংহ

আমাকে দেখে বলেছিলেন, "অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর সঙ্গে একা যুদ্ধ করবার ক্ষমতা এর হবে—শুধু অভিমন্যু অবশেষে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু জয়ন্তের অদ্ভুত রণকৌশলকে পরাস্ত করতে সপ্ত কেন, চতুর্দশ রথীও কোনদিন সমর্থ হবে না।" তিন বৎসর পরে বিজয়গৌরবে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলাম। এসে দেখি, একবৎসর পূর্বে আমি মাতৃহারা হয়েছি, কিন্তু পাছে আমার শিক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটে, সেজন্য পিতা আমাকে কোন সংবাদ দেননি।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জয়ন্ত বলিতে লাগিল, "তারপর কেমন করে কি হলো, ভাল করে আমি নিজেই জানি না—আপনাকে কি বোঝাব? শুধু দেখলাম, দিনে দিনে, ধাপে ধাপে আমি অনেক নীচে নেমে গেছি। আমার পিতার সংসারে আমার আর স্থান ছিল না—নিজের ভাগ্য সম্বল করে সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অস্ত্রচালনাটাই ভাল লাগতো সব চাইতে বেশি, সৈনিকদলে যোগ দিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু মনের তৃপ্তি আর কোথাও খুঁজে পেলাম না। তৃপ্তির সন্ধানে প্রথম যৌবনের দিনগুলি কত কলঙ্ক আর গ্লানির মধ্যে অবিরত খুঁজে বেড়িয়েছি, সেকথা শুনলেও আপনার মন এখনই বিষাক্ত হয়ে উঠবে।......কিন্তু থাক, আর না, আপনার নিষ্কলুষ মনের কাছে এ কলঙ্কের কাহিনী যতটুকু বলেছি তাই যথেষ্ট! এক একবার মনে হয়, সময় থাকতে যদি আপনার দেখা পেতাম, হয়তো আমার জীবনের ধারাটাই আমূলে পরিবর্তিত হয়ে যেতো। কিন্তু তা হলো না। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখলাম—আপনার পবিত্র, উজ্জ্বল চক্ষুর দিকে তাকিয়ে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আপনাকে আমার জীবনে লাভ করার সম্ভাবনা যদি থাকতো, হয়তো আমার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পেতে পারতাম, হয়তো আমার লুপ্ত শক্তি আবার জেগে উঠতো। এমন কি শুধু আপনার শ্রদ্ধা লাভ করবার দুরাশাও হয়তো আমার বিলুপ্ত মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হতো। কিন্তু দেখলাম, দাবীর অধিকার জন্মাবার আগেই ভাগ্যের দরবারে আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি। সেদিন থেকে আমার বিষয়ে ক্ষীণতম আশা আমার যা অবশিষ্ট ছিল, তাও নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে—আমার সম্বন্ধে কোন মঙ্গলই আর আমি এখন ভাবতে পারিনে।"

সুনন্দা দুঃখিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এখনও তো আপনি ইচ্ছা করলে আপনার জীবন সুন্দর করে তুলতে পারেন। এত মহৎ যাঁর অন্তঃকরণ, এত প্রবল যাঁর শক্তি, তাঁর পক্ষে পৃথিবীতে অসম্ভব কি আছে?"

নির্নিমেষ-নেত্রে তাহার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জয়ন্ত বলিল, "সুরথের জন্য আমি সেদিন যা করেছিলাম, সেকথা মনে করে বলছেন? আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহলে এখানেও আপনার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাক্ সুনন্দা দেবী—সেদিন সুরথের দুর্দশা দেখে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে, অথবা তার বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে কোন কাজ আমি করিনি। তাকে বাঁচাতে যে চেষ্টা আমি করেছিলাম, সে শুধু আপনার জন্য—সেই প্রথম দিনেই আপনার চোখের জল সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলে।"

একটু হাসিয়া সে আবার বলিল, "এখন বোধ হয় আমার মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আপনার মন থেকে মুছে গেল, সুনন্দা দেবী? না, না, আমার সম্বন্ধে কোন ভুল আশা আমি মনে পোষণ করি না। মনুষ্যত্বের এক বিন্দুও আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আমার অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল জীবন আমার সকল সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুরথের প্রতি সহানুভূতি? সুনন্দা দেবী, কতদিন গভীর রাত্রে নির্জন রাজপথ দিয়ে একসঙ্গে ফিরতে ফিরতে আমার মনে হয়েছে, তরবারির একটি আঘাতে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মত তাকে সরিয়ে দিই। যে অনুপম সৌভাগ্য সমস্ত মন দিয়ে কামনা ক'রেও আমি কোন দিন পাব না, তারই অধিকার লাভ করে প্রফুল্লমুখে সে যেন আমার সামনে আর ঘুরে না বেড়ায়। তাকে দেখে আমার মনের অশান্তির আগুন আরও ধু ধু করে জ্বলে উঠতো—ক্ষোভে, হতাশায় আমি উন্মাদের মত হয়ে যেতাম। অস্ত্রবল বা বাহুবলে যদি আজ যোগ্যতার পরীক্ষা হতো, তাহলে আমার সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতাও সুরথের থাকতো না, একথা ভাল করে জানতাম বলেই আমার উন্মত্ততা যেন আরও সহস্র গুণ বেড়ে যেতে চাইত। কিন্তু দুটি জিনিস সে সর্বনাশ থেকে আমাকে প্রতি মুহূর্তে সংযত করে রেখেছে—আমার নিজের অযোগ্যতার স্মৃতি আর আপনার কোমল, পবিত্র মুখ। আমাকে দেখে ভয় পাবার কারণ আপনার এখন আর নেই, সুনন্দা

দেবী—সে উন্মত্ততা আমি জয় করেছি। আপনার সামান্য একটি কেশের অনিষ্টও আমি করতে পারিনে, আমাকে দিয়ে কোন ক্ষতি কোন দিন আপনার হবে না। আজ রাত্রেই আমি পূর্বদিকে যাত্রা করছি, জীবনে হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ ঘটবে না। কিন্তু যদি হয়, তবু মনে রাখবেন, আমি আপনার বন্ধু হয়েই রইলাম, শত্রু আমি নই।"

ক্ষণ-আরক্ত, ক্ষণ-পাণ্ডুর মুখে সুনন্দা একমনে জয়ন্তের কথা শুনিতেছিল। যাহাকে স্নিগ্ধ শ্যামল উদ্যান মনে করিয়া সে এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া ছিল, আজ অকস্মাৎ তাহার তৃণাচ্ছাদনের অন্তরালে প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কথা জানিতে পারিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জয়ন্তের রাত্রিজাগরণ-ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে চাহিয়া একটি স্নিগ্ধ মমতা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। দেবদানবের অহর্নিশি নিদারুণ দ্বন্দ্বের এই রঙ্গভূমি কি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াই না পড়িয়া আছে! কোটরগত চক্ষুর তীব্র জ্যোতি কালিমায় ম্লান, শ্রান্ত ললাটে যন্ত্রণার কুঞ্চিত রেখা, ওষ্ঠাধরে নিদারুণ নৈরাশ্য ও ক্লান্তির চিহ্ন। দেখিয়া সুনন্দার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল, "অকৃত্রিম বন্ধু বলে চিরদিন আপনাকে জেনেছি, আজও তাই জানব। আপনাকে দিয়ে কোন ক্ষতি আমার হবে, এ আশঙ্কা আমার একটুও নেই। নিজেকে চিরদিনের জন্য দেশান্তরে কেন নির্বাসিত করতে যাচ্ছেন? মানুষের জীবন কখনও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না—যে জীবনযাত্রার প্রণালী আপনার অযোগ্য, যা আপনার কাছে এত গ্লানিকর বলে বোধ হচ্ছে, আমার একান্ত মিনতি, তা আপনি ত্যাগ করুন। আপনি আবার সুখী হবেন। আপনার সুখে আমরাও কত সুখী হব!"

বিমর্ষমুখে জয়ন্ত একটু হাসিল, "সে চেষ্টা করার দিনও আমার পার হয়ে গেছে, সুনন্দা দেবী! এখন আমি ক্রমাগত আরও নীচে নেমে যাব, উঠবার ক্ষমতা আমার আর নেই। জীবনটাকে দু'হাতে ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছি আজ প্রায় দশ বৎসর, এত দীর্ঘদিনের সংস্কার, অভ্যাস, জয় করে উঠবার সামর্থ্য আমি এখন কোথায় খুঁজে পাব? সে জয়ন্ত একদিন ছিল, সে আর বেঁচে নেই। প্রথম যৌবনেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার দেহধারী প্রেতাত্মা এখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত দেহে কি দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করবেন আপনি? বিধাতা আমার ভাগ্যে নৈরাশ্য আর

ব্যর্থতাই শুধু লিখেছিলেন। কোন কিছুতে সার্থকতা লাভ করা আমার অদৃষ্টে নেই।”

বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে সুনন্দা বলিল, “আপনার দুঃখময় জীবনে আমিও কেবল দুঃখই আপনাকে দিলাম, একথা মনে করে কোনদিন আমি শান্তি পাব না!”

নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জয়ন্ত বলিল, “ওকথা বলবেন না, সুনন্দা দেবী—আমার দুর্ভাগ্যে দুঃখ করবার বাস্তবিক কোন কারণ নেই। আমার ব্যর্থতার জন্য আপনার সুখময় জীবন কেন অনর্থক ম্লান হবে! সুরথ যদি না-ও থাকত, তবু আপনাকে লাভ করবার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত আমি করতাম কিনা সন্দেহ। আমার এ গ্লানিপূর্ণ জীবনের সঙ্গে আপনার অম্লান জীবন জড়িত করে কি সুখ আমি পেতাম? আপনি আমাকে টেনে তুলতে হয়তো সক্ষম হতেন না, কিন্তু আপনার পবিত্র সুন্দর প্রাণটিকে দিনে দিনে, ধাপে ধাপে, কলুষ আর ব্যর্থতার মধ্যে আমি টেনে নিয়ে যেতাম। তার চেয়ে যা হয়েছে, এই ভালো হয়েছে, এ কি আমি জানি নে? দেবতার যে ধ্বংসস্তূপ, সে কি কোনদিন পায় দেবতাব স্থান? দেবভোগ্য পুষ্পমাল্য যোগ্যজনের কণ্ঠলাভ করেই সার্থক হয়। আমার মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক অতিক্রম করে সুখস্বপ্নের লূতাতন্তুজাল—এমন করে যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এ ভালোই হয়েছে। সুনন্দা দেবী, আপনার এতটুকু বিশ্বাস ও সহানুভূতি আমি লাভ করেছি, এই-ই আমার ব্যর্থ জীবনের চরম পুরস্কার। আমার এ অভিশপ্ত জীবন যখন যেখানে যেমন করে শেষ হয়ে যায়, যাক—আমার দুর্ভাগ্য মনে করে আপনার চক্ষু একদিন অশ্রুসজল হয়ে এসেছিল, আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস জেনেও আমার প্রতি বিশ্বাস আপনার নষ্ট হয়নি, এই স্মৃতি আমরণ আমার হৃদয়ে বিষদহনে অমৃতবিন্দুর মত জেগে থাকবে। আজ যাবার দিনে একটি অনুরোধ আপনাকে করে যাই। কোনদিন যদি আপনার প্রয়োজন হয়, আপনার শান্তিময় সুন্দর জীবন কোন বিপদের ছায়ায় মলিন হয়ে ওঠে, অযোগ্য হলেও বন্ধু বলে সেদিন আমায় স্মরণ করবেন। আপনার পথের ক্ষুদ্রতম কণ্টক দূর করে দেবার জন্য প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হব না।”

যুক্তকরে সুনন্দাকে নমস্কার করিয়া জয়ন্ত ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়া

গেল। পরক্ষণে প্রাঙ্গণে তাহার অশ্বপদ সবেগে ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিয়া সুনন্দা চাহিয়া দেখিল, জয়ন্ত তীরবেগে যেন বাতাসের আগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চাহিয়া সুনন্দার চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কয়েকদিন মাত্র পূর্বে এই গৃহে অপর একটি তরুণ হৃদয় ব্যগ্র-উৎকণ্ঠায় তাহার নিকটে প্রেম নিবেদন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সেদিন সে বিজয় গৌরবে কণ্ঠে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল বরমাল্য, আজ জয়ন্ত ফিরিয়া চলিয়াছে নিদারুণ ব্যর্থতার বোঝা বহিয়া! সুখে সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও এই ব্যর্থ জীবনের প্রতি সহানুভূতিতে সুনন্দার নেত্র হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল!

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

উত্তরাপথের এক প্রান্তে যখন ভাগ্যবিধাতাব চক্রান্তে সুরথ-সুনন্দা-জয়ন্তের অদৃষ্ট এক জটিল সূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইতেছিল, তখন তাহার অপর প্রান্তে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব উপায়ে একটি জটিলতর গ্রন্থির সূত্রপাত হইতেছিল।

তখন পূর্ণ বর্ষাকাল। আষাঢ় মাসেব কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। সমস্ত দিন ধরিয়া অনবরত বারিবর্ষণের ফলে পথ-ঘাট কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে যতদূর চোখ যায়, মেঘাচ্ছাদিত পাণ্ডুবর্ণ আকাশ শ্রান্ত দেহে দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই নিশ্ছিদ্র মলিনতা ভেদ করিয়া সূর্য-রশ্মির একটি ক্ষীণ রেখাও পৃথিবীর নিকটে পৌঁছিতে পারিতেছে না। সপ্ত-কীর্তিরত্নমণ্ডিত, গগনস্পর্শী সৌধ-শিখর-সম্বলিত গৌড়ের রাজপথ এই দুর্দিনে আজ জনহীন। অবিরত বারিপাতের পরেও গৌড়ের আকাশের সঞ্চিত অশ্রু নিঃশেষিত হয় নাই বলিয়াই যেন পশ্চিম দিগন্তে ঘন কৃষ্ণ মেঘের ভ্রূকুটি ক্রমে করাল হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের রক্তচক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিরামহীন বর্ষায় যে নাগরিকগণ রুদ্ধদ্বার গৃহের অন্তরালে নিশ্চিন্তে

নীচজাতি হলেও আমাদের ক্ষমতা এই অভিজাত কুলোদ্ভিত ভূস্বামীগণের চেয়ে কোন অংশে কম নয়! নীচ বলে আমাদের নামে যে কলঙ্ক এরা অর্পণ করেছে, সে গ্লানি আমরা আজ হ'তে রক্তের স্রোতে মুছে ফেলে দেব।"। বলিতে বলিতে চক্ষুর দৃষ্টিতে তাহার বজ্রের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দুই সবল বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া ভীমকণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "ভাই সব! তোমাদের এই 'নীচ' বাহু কত শক্তি ধরে, এই অভিজাত সম্প্রদায় তা জানে না। তোমরা যুগ যুগান্ত ধরে কঠিন মৃত্তিকায় বিপুল বলে হলচালনা করে পাষাণকে উর্বর করে তুলেছ, কুঠারের আঘাতে বিশাল বৃক্ষ মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে ঘন অরণ্যের নিকট হতে মনুষ্য-বসতির স্থান কেড়ে নিয়েছ। গৌড়-বঙ্গ-মগধের সুবিশাল রাজপথ তোমাদেরই সহস্র কোটির অযুত কোটি রক্তবিন্দুতে গড়ে উঠেছে। গৌড়ের এই গগনস্পর্শী অট্টালিকাগুলি দিনের পর দিন তোমরাই প্রাণ দিয়ে নির্মাণ করে তুলেছ! তোমাদের শক্তির চেয়ে মহানায়ককুলের শক্তি কোন্ অংশে বড়? তোমরা ধর্মভীরু, তোমরা পরমবিশ্বাসী, তোমাদের সরল হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল। তাই একদিন যাকে প্রভু বলে স্বীকার করেছ, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শত অত্যাচারেও তোমাদের হাত ওঠেনি। কিন্তু এই দুর্বলতা আজ হতে মন থেকে সবলে তোমরা মুছে ফেলে দাও। প্রভুবংশ বলে ক্ষমা কোরো না, অত্যাচারীর বংশ বলে ঘৃণাভরে তাদের সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে চলে যাও। মহানায়ককুলের রত্নের লোভ মেটাতে গিয়ে মৃত্তিকাতলে খনির বুকে কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনাহারে, অত্যাচারে যারা প্রাণ দিয়েছে, সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে অথবা স্বেচ্ছাচারী ভূস্বামীর অশ্বপদতলে যাদের মৃতদেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে—বিচারের অভাবে পাটলিপুত্রের অন্ধকূপে অথবা মহানায়ককুলের কারাগৃহে যাদের শেষ নিঃশ্বাস অসীম যন্ত্রণায় বাতাসে মিশে গিয়েছে, প্রতিশোধ স্পৃহায় তাদের রক্ত আজ আমাদের আহ্বান করছে। মহানায়কবৃন্দের প্রভুত্বের দাবী এই লাঞ্ছনার ইতিহাসে ডুবে গিয়েছে। কোন কৃতজ্ঞতার স্মৃতি, কোন প্রভুভক্তির চিহ্ন আমাদের মনে এরা রাখতে দেয়নি। এই পরান্নভোজী অত্যাচারীদের সমূলে বিনষ্ট করে নূতন রাজ্য, নূতন সমাজ আমরা গড়ে তুলব। এদের কোন চিহ্ন যতদিন গৌড়-বঙ্গ-মগধে থাকবে, ততদিন আমাদের কোন মঙ্গল হবে না।

"ভাই সব! অত্যাচারিত প্রজার রাজাই একমাত্র বন্ধু, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে মহানায়কবৃন্দ রাজশক্তিকেও গ্রাস করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র করে তুলেছে! বিদেশী শত্রুর আক্রমণে আর দেশীয় সামন্ত-বর্গের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সার্ধ দ্বিশত বৎসরের কিছু পূর্বে গৌড়ের প্রজাশক্তি যে বিপুল পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল, সে সাম্রাজ্যের বর্তমান উত্তরাধিকারী আমাদের কাছে তাঁর সেই ঋণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন! ধর্মপালদেবের বিজয়বাহিনী যখন সুদূর গান্ধারদেশের সীমা অতিক্রম করে দূরতর পশ্চিমে অভিযান করেছিল, দেবপালদেবের অমিতশক্তিশালী সেনা যখন হিমালয়ের পাদদেশ হ'তে নর্মদাতীর পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথের রাজমুকুট সগৌরবে বহন করে গৌড়-বঙ্গ-মগধে ফিরে এসেছিল সেদিন আমাদেরই লক্ষ লক্ষের শক্তিতে যে তাঁদের গুল্মসেনা গঠিত হয়েছিল, দ্বিতীয় মহীপালদেবের সে কথা স্মরণ নেই! তিনি ভুলে গিয়েছেন, যে আমাদেরই সম্মিলিত শক্তি ও সহানুভূতিতে প্রাতঃস্মরণীয় প্রথম মহীপালদেব কাম্বোজ-চোল-গুর্জর সংঘাত প্রতিহত করে বিনষ্ট পিতৃরাজ্য পুনর্বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ পালরাজ্যের আশৈশব সহচর প্রজাবৃন্দকে ত্যাগ করে মহানায়ককুলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তিনি ভোগে, স্বেচ্ছাচারে, বিলাসে, ব্যসনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। প্রজা-নিপীড়ন তাঁর রাজত্বের মূল নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রজার ধর্ম ও নীতিজ্ঞান, তার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য—তার সামান্য সম্পত্তি, তার মানসিক শান্তি—জমীদারের হাতে যেমন, রাজার নিকটেও তেমনি লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। পাটলিপুত্রে মহীপালদেবের যে নবনির্মিত বিলাস-প্রাসাদ, তার প্রতিটি কক্ষ যে কত হতভাগ্য নরনারীর ক্রন্দনে, আর্তনাদে দিনের পর দিন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে, সে কথা আমাদের মধ্যে কে না জানে? আজ দুর্ভিক্ষে আর মহামারীতে নিষ্পেষিত হয়ে আমরা যখন নিঃশেষিত হয়ে যেতে বসেছি, তখনও মহীপালদেবের সৈনিক এসে তাঁর প্রমোদসভায় মদিরার উপকরণ যোগাতে আমাদের জীর্ণ কুটির হ'তে কুলের কুলবধূকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে! অনাহারে জর্জরিত তাদের কঙ্কালসার দেহে রূপলাবণ্যের যে ছায়াটুকু অবশিষ্ট আছে, প্রচণ্ড ভোগের দহনে তাই দগ্ধ করে দিতে গৌড়বঙ্গাধিপের এই নৃশংস লোলুপতা! দুঃখে দৈন্যে পরিপূর্ণ আমাদের

হতভাগ্য জীবনে স্ত্রীকন্যার শুচিতা রক্ষা করে বাঁচবার অধিকার পর্যন্ত যে রাজা হরণ করেন, আমাদের একমাত্র শান্তির আশ্রয় যাঁর বিলাসের খেয়ালে শিশুর ক্রীড়নকের মত ভেঙে পড়ে, তাঁর বিরুদ্ধেও যদি আজ আমরা দলবদ্ধ হয়ে না দাঁড়াই, তবে সত্যিই আমরা মানুষ নই! আমরাই এ পালবংশের প্রথম রাজাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলাম, আমরাই আজ সে বংশের সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণ করে পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যাব! পাটলিপুত্রের বিলাসপ্রাসাদ আর প্রমোদ উদ্যানের প্রস্তব একটি একটি করে খসিয়ে নিয়ে তাদের শ্মশানে পরিণত করে আমাদের সকলের বংশের কলঙ্ক অত্যাচারী রাজার রক্তস্রোতে মুছে ফেলে দেব। মহীপালদেবের রাজত্বের সামান্য চিহ্নও আর কোথাও অবশিষ্ট রাখব না!"

সহদেবের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জনসমুদ্রে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দিল। তাহাদের রোষ-ক্ষোভের সে অর্ধস্ফুট তর্জন স্ফুটতর হইতে না হইতে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ দ্রুতপদে মন্দিরদ্বার হইতে সহদেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিতকণ্ঠে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "সহদেব, তুমি আজ যে ব্রত গ্রহণ করে আমাদের আহ্বান করেছ, শিবশম্ভুর শপথ, যতদিন এ দেহে একবিন্দু রক্ত আছে, ততদিন আমি তোমার সহায়! আমার যুবক পুত্র তার স্ত্রীর প্রতি ব্যাঘ্রতটির মহানায়কপুত্রের হীনাচারের প্রতিবাদ করার ফলে কালিকার শ্মশানে কুক্কুরদংশনে প্রাণ দিয়েছে। আমার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ একমাস মহানায়কপ্রাসাদের কারাগৃহে আবদ্ধ থাকবার পর মুক্তি পেয়ে আমার চোখের সামনে জলে ডুবে মরেছে। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আমি, বৃদ্ধ, বেঁচে আছি। একবার ব্যাঘ্রতটির সেই প্রাসাদ জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত করবার সুযোগ আমায় দাও, শিব শম্ভো! তারপর আমায় নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছা কোরো! ঘাতক যদি তখন আমার দেহ তিলে তিলে অগ্নিদগ্ধ করে, তবু আমার দুঃখ নেই। সহদেব! মৃত্যুতে আমার ভয় নেই, কোন অত্যাচার আমি আর ভয় করিনে। বৃদ্ধ বলে আমাকে উপেক্ষা করে যেয়ো না—আমার প্রতিহিংসার শক্তি তুমি গ্রহণ কর।"

রোষে, ক্ষোভে, অপমানে বৃদ্ধ অর্ধমূর্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, সহদেবের ইঙ্গিতে দুইচারিজন মিলিয়া তাঁহাকে একপাশে সরাইয়া লইয়া গেল। তখন মন্দিরের অপর প্রান্ত হইতে একজন যুবক

সম্মুখে আসিয়া থরকম্পিত পাংশু-অধর সবলে দন্তাগ্রে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমার বৃদ্ধ পিতা অতিরিক্ত কর না দিতে পারার অপরাধে দন্ডভুক্তির বন্দীশালায় কশাঘাতে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ যদি আজ তুমি আমায় দিতে পার, তবে সহদেব! আমি তোমার ক্রীতদাস!" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে জনতার মধ্যে এক মহা কলরোল উত্থিত হইল। ক্ষুব্ধ আক্রোশে গর্জিয়া কেহ বলিল, "সহদেব! মহানায়ক যশোধবলদেবের অশ্বক্ষুরের আঘাতে আমার একমাত্র শিশুপুত্র যখন প্রাণ হারায়, তখন অসীম তাচ্ছিল্যভরে একটি সুবর্ণ মুদ্রা তার শোকার্তা জননীর পদতলে নিক্ষেপ করে তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলেন!" কেহ বলিল, "মৃতকল্প পৌত্রের জন্য স্বস্ত্যয়ন করাতে গিয়ে আমার বৃদ্ধা জননী নায়কপত্নী সুভদ্রাদেবীর সম্মুখে পড়েছিলেন, এই অপরাধে, সহদেব! সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে তাঁর প্রাণ যায়।" শোকে, ক্ষোভে, ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় জনসঙ্ঘের বিলাপে ও উত্তেজনায়, শতাব্দীর জীর্ণ মন্দির ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল। হস্তের ইঙ্গিতে সেই উন্মত্ততা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া সহদেব পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভাই সব! আমরা এই অরাজকতা নিবারণ করবার জন্যেই পালসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চলেছি—দেশকে রাজহীন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একদিন যে মুকুট গোপালদেবের হাতে আমরা তুলে দিয়েছিলাম, অনধিকারীর অপব্যবহারে সে মুকুট সার্ধ দ্বিশত বৎসর পরে আবার আমাদের হাতে ফিরে আসছে। আজ প্রজাশক্তির নির্বাচনে কোন্ নূতন রাজবংশ সে মুকুটধারণের অধিকার লাভ করবেন, তোমরা একবাব স্থির কবে বল! আমাদের এই বিপুল অভিযানে একজন নেতা চাই। নবনির্বাচিত মহারাজ সেই নেতৃপদ লাভ করবেন।"

জনারণ্য হইতে শত শত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "তুমি, সহদেব, সে তুমি!"

যুক্তকরে সকলকে অভিবাদন করিয়া সহদেব গম্ভীবস্বরে বলিল, "আমি তোমাদের সেনাপতি, তোমাদের দাসানুদাস—নেতা বা রাজা আমি নই। আমাদের রাজা যিনি হবেন, তাঁর আদেশে আমি তোমাদের নিয়ে পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, সাগর অবহেলাভরে অতিক্রম করে যাব, কিন্তু

তোমাদের যেমন, আমারও তেমনি আদেশ দিতে একজন রাজা চাই। এ-মন্দিরে দেববিগ্রহ আজ নেই, কিন্তু তবু এই দেবালয় বহু শতাব্দী যাবৎ দেবতার স্থান ছিল। এখানে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বরকে সম্মুখে রেখে তোমরা বল, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যার সততায়, বীরত্বে, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপরে আমরা অসঙ্কোচে নির্ভর করতে পারি? ব্যক্তিত্বে যে আমাদের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিনয়ে ও সহানুভূতিতে আমাদের সকলের সমান—ধৈর্যে যে অতুলনীয়, বুদ্ধি যার স্থির, গাম্ভীর্য যার অটল, জন্মগত অসামান্যত্বের অধিকারে যে জনসম্প্রদায়ের নেতা—এমন কার কথা তোমরা জানো?"

তখন সহস্র সহস্র উত্তেজিত কণ্ঠে চারিদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"দিব্যোক! দিব্যোক! দিব্যোক! দিব্যোক!"

দেখিতে দেখিতে উত্তাল জনতরঙ্গ একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষকে বহন করিয়া সকলের মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। তাঁহার ললাটে প্রতিভার দীপ্তি, দৃষ্টি স্থির, গম্ভীর—গম্ভীর আকৃতিতে সংহত শক্তির পরিচয়রেখা। তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত বিস্ময়ে সহদেবের নিকটবর্তী একজন যুবক মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "দিব্যোক—কৈবর্তপতি!" শুনিবামাত্র আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জিয়া সহদেব তাহার দিকে ফিরিল—"না! দিব্যোক—গৌড়বঙ্গাধিপতি! সহস্র সহস্র প্রজাহৃদয়ের উপর যাঁর এমন একচ্ছত্র অধিকার, জাতিতে কৈবর্ত হলেও ক্ষত্রকুলজাত মহীপালদেবের চেয়ে তিনি আমাদের অনেক বেশি সম্মানের পাত্র—নরপালরূপে অনেক বেশি কাম্য। ক্ষত্রিয়কুলের আধিপত্যের যুগ অতীত হয়ে গিয়েছে, তাদের সৃষ্ট শ্রেণীগত বৈষম্যও তাদের সঙ্গে সঙ্গে অতল জলে ডুবে গিয়েছে। এখন বঙ্গে, রাঢ়ে, বরেন্দ্রভূমিতে একমাত্র ন্যায়গত অধিকারী—প্রজানির্বাচিত মহারাজ দিব্যোক!"

দৃঢ়পদে দিব্যোকের সম্মুখে আসিয়া সে নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহার ইঙ্গিতে রুদ্রক নামে এক কর্মকারপুত্র নব-নির্মিত শাণিত অসি দিব্যোকের হাতে তুলিয়া দিল। অসি কোষবিমুক্ত করিয়া দিব্যোক জনতার দিকে ফিরিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার উল্লসিত, উচ্চ কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"দিব্যোক! দিব্যোক! দিব্যোক! দিব্যোক!"

সেই ধ্বনি দিকে দিগন্তরে ছুটিয়া গিয়া গৌড়সাম্রাজ্যের নূতন রাজার অভিষেকবার্তা যেন অরণ্যে, কান্তারে ঘোষণা করিয়া দিল।

মহারাজ গোপালদেবের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে বা পরে আর এইরূপ ধ্বনি বঙ্গে বা ভারতে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

শয়নকক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুরথ অদূরবর্তী শিপ্রার জলে সন্ধ্যার শোভা দেখিতেছিল, এমন সময়ে বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে একখানি গোপনীয় পত্র তাহার নিকটে গিয়া পৌঁছিল।

পত্রের শীলমোহরে বিগ্রহদেবের লাঞ্ছন দেখিয়াই সুরথের মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভৃত্যের হস্ত হইতে পত্র লইয়া সে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিল। গৌড়ের বিদ্রোহের সংবাদ লোকপরম্পরায় উজ্জয়িনীতেও কিছু কিছু আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। একবার বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে অত্যাচার-নিপীড়িত প্রজার হস্তে মহানায়কসম্প্রদায়ের ভাগ্য কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেকথা ভাল করিয়া জানিত বলিয়াই সুরথের মনে তাহার পিতৃব্যের সম্বন্ধে আশঙ্কার অন্ত ছিল না। চিঠিখানি হাতে করিয়া সে একটি নিভৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া পড়িতে লাগিল—

"মহানায়ক,

আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও যেহেতু বংশ পরম্পরায় আপনি আমার প্রভু, এবং আমি আপনার বিশ্বস্ত দাস, সেজন্য ঘোরতর বিপদে নিপতিত হয়ে আপনাকেই আমি স্মরণ করছি। আপনাদের পাটলিপুত্র-সংলগ্ন ভূসম্পত্তির কর আদায় ও শাসনের ভার যার হাতে বংশানুক্রমে ন্যস্ত ছিল, সেই ব্রহ্মদাসকে সম্ভবতঃ আপনার স্মরণ আছে। আমি ব্রহ্মদাসের একমাত্র পুত্র ধর্মদাস। গত তিন বৎসর যাবৎ আপনাদের সিংহশীলা গ্রামের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ আমিই করে আসছি। চিরদিন পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমি প্রভুর কার্য সম্পাদন করতে

চেষ্টা করেছি, কিন্তু বর্তমানে সেই বিশ্বস্ততাই আমার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই উপায়ান্তর না দেখে আজ আমার প্রভুবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর শরণাপন্ন হতে আমি বাধ্য হয়েছি।

মহানায়ক! গৌড়ের প্রজা-বিদ্রোহের সংবাদ কি আপনাদের ওখানে পৌঁছায়নি? মহারাজ শ্রীমৎ মহীপালদেব এখন আর সিংহাসনে নেই। বিদ্রোহী প্রজাদল তাঁকে কারারুদ্ধ করে দিব্যোক নামে এক কৈবর্তনায়ককে সিংহাসনে স্থাপন করেছে। মহানায়কসম্প্রদায়ের সমস্ত শক্তি তাদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। গৌড়-বঙ্গকে আপনি যেমনটি দেখে গিয়েছিলেন, এ দেশের সে রূপ আর নেই। অভিজাতবংশের নায়ক ও মহানায়কগণের বিরুদ্ধে প্রজাবৃন্দের আক্রোশ ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে উঠেছে। প্রজাদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের পরেও মহানায়ককুলের যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ আজ কারারুদ্ধ। শুনতে পাচ্ছি, প্রজাদের সম্মুখে বিচার হওয়ার পরে শীঘ্রই তাঁদের, ও শ্রীমন্মহারাজের প্রাণদণ্ড হবে! অত্যাচারী অভিজাতবংশের কে কোথায় লুকিয়ে আছেন, তাঁদের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দেবার জন্য বিদ্রোহী প্রজাদল গৌড়ের গ্রামে গ্রামান্তরে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই ধবল, উত্তম ও সিংহবংশের পুত্রগণের ছিন্নমুণ্ড পাটলিপুত্রের বধ্যভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে। বিদ্রোহীরা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা পরশুরামের মত সমস্ত পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে তবে ক্ষান্ত হবে!

মহানায়ক! পাটলিপুত্রের নবতর অংশে যে বিরাট রাজপ্রাসাদ মহারাজ বিগ্রহপালদেব নির্মাণ করে গিয়েছিলেন, তার কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আকর সেই অপরূপ 'মোহনপ্রাসাদের' একটি ইষ্টকখণ্ডের অস্তিত্বও আজ আর অবশিষ্ট নেই। বিদ্রোহী প্রজার তরবারির আঘাতে তার স্ফটিকের প্রাচীর, তার অনুপম ভাস্কর্য, তার অপরূপ চিত্রের সম্ভার ধূলায় লুটিয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীর দল পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রত্যেকটি কারাগৃহ এবং অন্ধকূপ থেকে বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে এসে তারপর সেই কারাগারগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে। পালসম্রাটগণের চেষ্টায় যে নূতন কুসুমপুর ধীরে ধীরে অপরূপ শোভায় সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছিল, আজ তা মহাশ্মশানে পরিণত! দিনের পর দিন অভিজাত

সম্প্রদায়ের রক্তে সে মহাশ্মশান অধিকতর রঞ্জিত হয়ে উঠছে। মহানায়ক! অকস্মাৎ সমস্ত জগৎ কেমন করে সম্পূর্ণ উল্‌টে গেল?

শুধু পাটলিপুত্রে বা গৌড়ে নয় মহানায়ক, যে প্রজাবিদ্রোহ প্রথমে শুদ্ধ বরেন্দ্রভূমিতে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা ধীরে ধীরে সমস্ত গৌড়-বঙ্গ-মগধ গ্রাস করে ফেলেছে। যেখানে মহানায়ককুলের শাসনের চিহ্ন, সেখানেই প্রজাবৃন্দের জ্বলন্ত আক্রোশ। আপনার পরমারাধ্য পিতৃব্য পূজ্যপাদ বিগ্রহদেব যে বিদ্রোহের প্রারম্ভেই গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হয়েছিলেন, এ সংবাদ সম্ভবতঃ আপনার অবিদিত নেই। তাঁর মৃত্যুর পরে রাঢ়ে ও বরেন্দ্রদেশে যেখানে তার যে সম্পত্তি ছিল, সমস্ত অধিকার করে বিদ্রোহীর দল তাঁর প্রত্যেকটি প্রাসাদ এবং উদ্যান জ্বালিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি সিংহশীলা তাদের হস্তগত হওয়াতে আমাকেও তারা কারারুদ্ধ করেছে। আমি এবং আমার পিতৃপিতামহ প্রজাদের নিকট হ'তে অধিক-মাত্রায় কর গ্রহণ করতে গিয়ে চিরদিন তাদের উৎপীড়ন করে এসেছি, এই অপরাধে নাকি শীঘ্রই আমাকে শূলে যেতে হবে! মহানায়ক! মহানায়ক! আপনি জানেন, আমরা আপনাদের বিশ্বস্ত অনুচর! এপর্যন্ত আমরা সিংহশীলায় যা কিছু করেছি, সে শুধু অন্ধের মত আপনাদেরই আদেশ পালন করতে গিয়ে! আমাদের একান্ত প্রভুভক্তির চরম পুরস্কার কি এই শোচনীয় মৃত্যু? মহানায়ক, আপনি কোনদিন প্রজাদের উপরে কোন অত্যাচার করেননি—আপনার উপরে নিশ্চয়ই তাদের কোন আক্রোশ নেই! আপনি অনুগ্রহ করে একবার পাটলিপুত্রে আসুন, এসে তাদের বুঝিয়ে বলুন, যে অত্যাচারের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে তারা আনয়ন করেছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ! কেবল আপনার পিতৃদেব ও খুল্লতাতদের আদেশই আমাকে করনির্ধারণ ও গ্রহণে বাধ্য করেছে। কিন্তু মহানায়ক, বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতা কি অপরাধ? আপনি একবার এসে সেই কথাটি এদের ভাল করে বুঝিয়ে বলুন! আমাকে রক্ষা করুন!

মহানায়ক, সম্পত্তির উপরে স্বত্বত্যাগ করলেও বিগ্রহদেবের মৃত্যুর পর আপনিই এ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী, আপনিই আমাদের প্রভু-বংশের একমাত্র বংশধর। তাই এই ঘোরবিপদে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আশ্রিতকে রক্ষা করে আপনি ক্ষাত্রধর্ম পালন করুন—শরণাগত বিশ্বস্ত ভৃত্যকে এই দারুণ দুর্দিনে পরিত্যাগ করবেন না। বহু বিঘ্ন

অতিক্রম করে অতি গোপনে আমি মহানায়ক সুরথদেবের উদ্দেশ্যে এই লিপি প্রেরণ করছি। আশা করি, আমার ব্যাকুল মিনতি তিনি উপেক্ষা করবেন না।"

পত্র সমাপ্ত করিয়া সুরথ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিগ্রহদেব তবে আর নাই! সেই গর্বোদ্ধত মস্তক গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। যে জনবিপ্লব সুরথ এতদিন আশঙ্কা করিতেছিল, আজ তাহা সত্য সত্যই গৌড়-বঙ্গ-মগধকে ধ্বস্ত, বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহাকালের বিচিত্র গতিতে কাল যে ছিল অত্যাচারী প্রভু, আজ সে ধূলিলুণ্ঠিত, করুণাভিখারী! কিন্তু হতভাগ্য ধর্মদাস! মহানায়কগণ তাঁহাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিলেও সে যে সত্যই সম্পূর্ণ নিরপরাধ! তবে কি এই চির-বিশ্বস্ত ভৃত্যবংশের একমাত্র পুত্রকে সত্য সত্যই প্রভুকুলের পাপের ফলভাগী হইয়া শ্মশানে অতি নিষ্ঠুর মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে? নিরুপায় সুরথের চিত্ত নানা বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে, উত্তেজনায়, বিক্ষোভে মথিত হইতে লাগিল। ধর্মদাসের পত্র দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে নিষ্পেষিত করিয়া সে শিপ্রার কৃষ্ণায়মান অবিরাম স্রোতধারার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সময় যতই অতীত হইতে লাগিল, ততই ধর্মদাসের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে যাত্রা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই তাহার ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করার পথ রহিল না।

বহুক্ষণ এইরূপ নির্জন চিন্তায় অতিবাহিত হইবার পর দ্বার খুলিয়া সহাস্যমুখী সুনন্দা একটি ফুলের মত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরথের স্কন্ধ মৃদুভাবে স্পর্শ করিয়া হাসি-ভরা মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এতক্ষণ একা এঘরে বসে কি এত ভাবনা ভাব্‌ছ? সমস্ত বিকালটা আমাদের কাছে একটিবারও গেলে না?"

সুরথ অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "একটা দরকারী কথাই ভাবছিলুম, সুনন্দা। সেকথা তোমায় পরে বলব। আজ তোমার কাছে কে কে এসেছিলেন? তোমার আসতে এত দেরী হ'ল যে?"

শিশুকে সুরথের পায়ের নিকটে বসাইয়া দিয়া সুনন্দা তাহার অতি নিকটে আসিয়া বসিল। সুরথের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে

লইয়া উত্তর দিল, "গৌরী-কাকা এসেছিলেন; জানতো, সুদেবকে ছেড়ে তিনি একটি দিনও থাকতে পারেন না! তিনি চলে যেতে তবে আমি এদিকে আসতে পেরেছি। এতক্ষণ তোমাকে না দেখে আমরা মনে করেছিলাম তুমি বুঝি বাইরে গিয়েছ। কিন্তু তুমি কি কথা ভাবছিলে, আমার বলবে না? তোমার মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!"

সুনন্দার হাতটি সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া সুরথ অসীম নির্ভরতার সঙ্গে তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে মুখে স্থির প্রেম অচঞ্চল একাগ্র দৃষ্টিতে ধ্রুবতারার মত জ্বলিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া সুরথের মনে হইল, সুনন্দাকে সকল কথা খুলিয়া না বলার কোন কারণই থাকিতে পারে না। সে বলিল, "একটা খুব গুরুতর ব্যাপার আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে সুনন্দা, তোমাকে সেকথা বলব কিনা, তাই ভাবছিলুম। কিন্তু তোমার কাছে কিছু গোপন করার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি সব কথা আগে শোনো, তারপর বলে দাও আমি এখন কি করব!"

তখন সুরথ ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা সুনন্দাকে খুলিয়া বলিল। বিগ্রহদেবের সহিত তাহার শেষ সাক্ষাতের কথা, ধর্মদাসের পত্র, গৌড়ে বিদ্রোহের বর্তমান অবস্থা, মহানায়কবংশের প্রতি প্রজাদের মনোভাব, কিছুই গোপন করিল না। অবশেষে সে বলিল, "আমাদের বংশের প্রতি বিশ্বস্ততাই ধর্মদাসকে এই বিপদে টেনে এনেছে। আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে কোন ভাল ফল হবে কিনা, সেকথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু অভিজাতসম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণায় আমি পিতৃপিতামহের সম্পত্তি ত্যাগ করে থাকলেও আমার ধমনীতে যে তাঁদের রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে, একথা আমি কেমন করে ভুলব? ধর্মদাস আজ যে বংশের শরণাগত, আমিই তার একমাত্র প্রতিনিধি। এ অবস্থায় আমাকে তুমি কি করতে বল, সুনন্দা?"

সুনন্দা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার পর স্থির কণ্ঠে বলিল, "তুমি ক্ষত্রিয়, আশ্রিতকে তুমি পরিত্যাগ করতে পারো না। আজ রাত্রেই তুমি পাটলিপুত্র চলে যাও, গিয়ে যে করে হোক ধর্মদাসকে উদ্ধার করতে চেষ্টা কর। বিপদ তাতে যতই থাক, এছাড়া তোমার অন্য পথ নেই।"

সুরথের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সপ্রশংসয় দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ঠিক এই কথাটিই তোমার নিকটে আশা করেছিলুম, সুনন্দা! তুমি তাহ'লে আজ রাত্রেই আমার যাত্রার ব্যবস্থা করে দাও! কিন্তু মনে বেশি কষ্ট কোরো না, সুনন্দা! আমার ফিরে আসতে খুব বেশি দিন হবে না। তোমার শুভকামনা যদি আমার সঙ্গে থাকে, তাহ'লে কোন বিপদেই আমার কোন ক্ষতি হবে না, একথা তুমি নিশ্চয় জেনো।"

সন্ধ্যাতারকার মত দুটি চক্ষু সুরথের মুখের প্রতি তুলিয়া ধরিয়া সুনন্দা মৃদু মৃদু হাসিল। তাহার পর অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, "গৌড়ে যেতে অনুমতি দিয়েছি বলে তুমি বুঝি মনে করেছ, তোমাকে এই বিপদের মুখে আমি একা যেতে দেব? তা কিছুতেই হবে না। সুদেবকে বাবার কাছে রেখে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সুনন্দার সংকল্প শুনিয়া চমকিত হইয়া সুরথ বলিল, "সে কি করে হবে সুনন্দা? না, না, সে যে অসম্ভব! এই ভয়ংকর বিদ্রোহের মধ্যে গৌড়ে যেতে তোমাকে আমি কিছুতেই অনুমতি দিতে পারিনে। তাছাড়া সুদেবকে রেখে যাওয়াও তোমার কোনমতেই চলতে পারে না। লক্ষ্মীটি, এ কল্পনা তুমি ত্যাগ কর।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সুনন্দা বলিল, "তবে আমি সুদেবকে নিয়েই যাব। এই বিপদের মধ্যে তোমায় রেখে আমি কিছুতেই এত দূরে থাকতে পারব না।"

বিপন্ন সুরথ মিনতি করিয়া বলিল, "সুনন্দা, তুমি সত্যি বুঝতে পারছ না, এ অবস্থায় আমার সঙ্গে গেলে তুমি আমার সহায় না হয়ে বিঘ্নই হয়ে দাঁড়াবে। এই বিপদসংকুল নগরে আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে থাকব, না ধর্মদাসের উদ্ধারের চেষ্টা করব? তাছাড়া ভেবে দেখ, আমি একা গেলে দ্রুতগামী অশ্বে খুব অল্প সময়েই পাটলিপুত্রে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব। কিন্তু তোমরা গেলে শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে যেতে আমার অনেক বেশি দেরী হয়ে যাবে। এবারের মত আমার সঙ্গে যাওয়ার চিন্তা তুমি ত্যাগ কর, সুনন্দা!"

সুনন্দা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তা যদি হয়, তাহ'লে আপাততঃ তুমি একাই যাও। সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ এবং অনুচর

নিয়ে যেয়ো, প্রত্যেক চটিতে পেঁছে তোমার সংবাদ দিয়ে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। যদি ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন তোমার সংবাদ না পাই, তাহ'লে যে ভাবেই হোক, তোমার কাছে আমি চলে যাব, এ তুমি নিশ্চিত জেনো।" তখন সুনন্দা ও সুদেবের নিকটে বিদায় লইয়া, আপাততঃ তাহার যাত্রার সংবাদ ও উদ্দেশ্য অন্যান্য সকলের নিকট হইতে গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়া বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সুরথ পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অশ্ব সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া না গেল, সুনন্দা অশ্রুস্তম্ভিত চক্ষে, স্থিরমূর্তিতে সুদেবকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধাত্রীর ক্রোড়ে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া নিজ কক্ষের নির্জনতায় দেব-বিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা কেমন করিয়া একটি অশ্বারোহী পথিককে পথে, প্রান্তরে অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল, সেকথা সে ছাড়া অপর কেহ জানিল না।

*　　*　　*　　*

তিনদিন পর পাটলিপুত্রের পশ্চিমতোরণে আসিয়া সুরথ যখন ধূলিধূসরিত, শ্রান্ত দেহে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সম্ভবতঃ পরদিন নগরে কোন একটা বিশেষ উৎসব ছিল বলিয়া চতুর্দিকের গ্রাম হইতে দলে দলে প্রজা নগরাভিমুখে যাইতেছিল। সুরথ লক্ষ্য করিল, সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া চিনিতে পারিয়াও কেহ তাহাকে অভিবাদন করিতেছে না, পূর্বের ন্যায় সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেও বিন্দু-মাত্র আগ্রহ দেখাইতেছে না। কেহ কেহ তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিতেছিল। কিন্তু অধিকাংশ প্রজাই তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছামত পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অবিরত প্রবাহমান এই জনস্রোত অতিক্রম করিয়া সুরথ যখন অবশেষে তোরণদুর্গের দ্বারে আসিয়া পেঁছিল, তখন অর্ধপ্রহর রজনী অতীত হইয়া গিয়াছে। দুর্গদ্বারে একজন অপরিচিত সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া সকলের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে নিজের পরিচয়পত্রটি তুলিয়া দিয়া সুরথ গভীরতম ক্লান্তিতে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিল। আজ রাত্রেই কারারুদ্ধ ধর্মদাস কোথায়, কি অবস্থায় আছে, তাহা তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু পাটলিপুত্র তাহার নিকট অপরিচিত হইয়া

উঠিয়াছিল। কোথায়, কাহার নিকটে গেলে সঠিক সংবাদ মিলিবে, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

সহসা প্রহরীর আহ্বানে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতে সুরথ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—আর সেই অপরিচিত সৈনিক পুরুষ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনিই মহানায়ক বিগ্রহদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরথ-দেব?" বিস্মিত সুরথ মস্তক অবনত করিয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিল। সৈনিকপুরুষ কিছুক্ষণ ভ্রূকুটিকুটিল ললাটে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সবেগে প্রহরীগণের দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "বন্দীকে এখনই কারাগৃহে নিয়ে যাও!"

শুনিয়া সুরথ বিহ্বলের মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কে বন্দী? কিসের বন্দী? কাহাকে কারাগৃহে লইয়া যাইতে হইবে? সৈনিক-গণ তাহার হস্তে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও সে যেন ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাই সে স্খলিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আমাকে তোমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ করছ? আমার কি অপরাধ?" প্রহরীর দল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। যে তাহার হস্তে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বন্ধু, তুমি গৌড় পরিত্যাগ করবার পর দেশের ভাগ্যের বহু পরিবর্তন ঘটেছে, সে সংবাদ রাখ কি? বর্তমানে গৌড়ের রাজা নূতন, তাঁর ব্যবস্থাও নূতন। বিগ্রহদেবের মত একজন মহানায়কের বংশে জন্মগ্রহণ করাটাই এখন সবচেয়ে বড় অপরাধ! এর ক্ষমাও নেই, কোন প্রতীকারও নেই।"

সুরথের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী একবার দুলিয়া উঠিল। বিহ্বলকণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু আমি তো কোনদিন প্রজাবর্গের উপর কোন অত্যাচার করিনি? আমার পিতৃপিতামহের কঠোর ব্যবস্থার প্রতিবাদ বরং চিরদিন করে এসেছি। আমাকে কারারুদ্ধ করে তোমাদের কি লাভ হবে?"

পূর্ববৎ হাসিতে হাসিতে প্রহরী বলিল, "সে তর্ক বধ্যভূমিতে গিয়ে ঘাতকের সঙ্গে কোরো। এখন প্রজাদের জন্য কি চমৎকার কারাগারের ব্যবস্থা তোমরা এতদিন করে রেখেছিলে, তাই বরং স্বয়ং গিয়ে পরীক্ষা করবে চল।"

প্রহরী সুরথের হাত ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল। হাত ছিনাইয়া লইয়া সুরথ বলিয়া উঠিল, "মহাপ্রতীহার—পাটলিপুত্রের মহাপ্রতীহার কোথায়? আমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাই!" অদূরে দণ্ডায়মান সৈনিকপুরুষের নিশ্চল মূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রহরী বলিল, "কেন? সেনাপতি সহদেবই তো তোমাকে কারারুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছেন। ইনিই তো বর্তমানে পাটলিপুত্রের মহাপ্রতীহার!"

"সহদেব?" সুরথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সেনাপতির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বহুদিন পূর্বে সুনন্দার মুখে শ্রুত একটি অর্ধবিস্মৃত কাহিনী তাহার স্মৃতিপটে ঝলসিয়া উঠিয়াছিল। দুই হাত যুক্ত করিয়া সে আগ্রহ-ভরে বলিল, "আপনি সেনাপতি সহদেব? বাসুদেবকে ধন্যবাদ! তাহলে আমার আর ভয়ের কারণ নেই! উমাপতি শ্রেষ্ঠীর আপনি একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন বলে শুনেছি, আমি তাঁর জামাতা—একথা বোধ হয় আপনি জানেন? আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। বহুদিন যাবৎ পিতৃপুরুষের অত্যাচারলব্ধ বিষয় মনের ঘৃণায় পরিত্যাগ করে আমি উজ্জয়িনীতে গিয়ে বাস করছি। আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন অভিযোগই থাকা সম্ভব নয়। উমাপতি শ্রেষ্ঠীর পবিবারের সঙ্গে আপনার পূর্ব সম্বন্ধের কথা স্মরণ করে আমার মুক্তির উপায় আপনি করে দিন।"

সহদেব কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "না, তোমাকে মুক্ত করতে কোন সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বিষয়ে কোন অনর্থক আশা তুমি হৃদয়ে পোষণ কোরো না। তোমাকে উদ্ধার করতে একটি অঙ্গুলিও আমি উত্তোলন করব না।"

বিমূঢ় সুরথ তাহার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পবে ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জেনেও শুদ্ধ পিতৃবংশের অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড আপনি হতে দেবেন?"

কঠোরস্বরে সহদেব বলিয়া উঠিল, "মহানায়ক সুরথদেব! নিরপরাধের প্রাণদণ্ড গৌড়ে এত নূতন নয় যে আপনি তাতে এত বিস্মিত হচ্ছেন! বহু নির্দোষ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন অন্যের অপরাধে আর অবিচারে আমরা প্রাণ হারাতে দেখেছি। ওকথায় আমাদের হৃদয় আর বিচলিত হয়

না। যে বিষাক্ত রক্ত আপনি দেহে বহন করছেন, তার মূল্য জীবন দিয়েই আপনাকে শোধ করতে হবে!" তারপর সহসা দন্তে দন্ত চাপিয়া সে নিরুদ্ধ ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, "মূর্খ! জীবনের প্রতি যদি সত্যই তোমার এত মমতা, তবে কেন সমস্ত জেনেও পাটলিপুত্রে এসেছিলে?"

সুরথকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বিদ্যুতের মত প্রহরীর দিকে ফিরিয়া বজ্রনির্ঘোষে সহদেব আদেশ করিল, "আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে একে এখনই বজ্রাসনের কারাগারে নিয়ে যাও!" দুই হাত যুক্ত করিয়া সুরথ ডাকিয়া বলিল, "মহাসেনাপতি! আর কোন অনুরোধ আপনাকে করতে চাই না! শুদ্ধ একটি ভিক্ষা—আমার পত্নীর নিকটে একটি সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করুন! আমি যে বজ্রাসনের কারাগারে মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষা করছি, এই কথাটি যেন আমার মৃত্যুর পূর্বে সে জানতে পায়!"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সহদেব বলিল, "তোমার কোন অনুরোধ আমার কাছে রক্ষিত হবে না—অনর্থক কেন বাক্যব্যয় করছ? আমাদের বহু আত্মীয়—বন্ধু—সহচর তোমাদের কারাগারে বিনা বিচারে তিলে তিলে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের মৃতদেহের অস্থি জীর্ণ হয়ে মৃত্তিকায় মিশে গেছে, তবু এই হতভাগ্যদের স্ত্রীকন্যা অশ্রুজলে দিবারাত্রি বক্ষঃ সিক্ত করেও তাদের সংবাদ পায়নি। তোমার স্ত্রী কোন্ অংশে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তার ভাগ্যে আজ অন্যরূপ ঘটবে?"

আর কোন কথা না বলিয়া সুরথ প্রহরীকে অনুসরণ করিয়া দুর্গের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্দীকে বজ্রাসনদুর্গে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি ভীষণাকৃতির মহিষ-বাহিত যান সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুরথ শকটে আরোহণ করা মাত্র চালকের কশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া মহিষ দুটি প্রচণ্ডবেগে নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। সুরথের শূন্য দৃষ্টির সম্মুখে তখন কেবল সুনন্দার প্রীতি-প্রফুল্ল মূর্তিটি ভাসিতেছিল। অকস্মাৎ এইরূপে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহার চিত্ত স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। অন্য কোন কথা চিন্তা করিবার শক্তি আর তাহার অবশিষ্ট ছিল না। বন্ধুর পথে শকট প্রচণ্ডবেগে ছুটিতেছিল। সুরথের ক্লান্ত মস্তক সেই বিপুল গতিতে বারবার টলিয়া পড়িতেছিল। নিদারুণ শ্রান্তিতে এই অবস্থায়ও কখন্ যে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে,

সে জানিতে পারে নাই। তাহার মনে হইতেছিল, সে উজ্জয়িনীতে শিপ্রাতীরে তাহাদের ক্ষুদ্র উদ্যানে ফিরিয়া গিয়াছে। সুনন্দা সহাস্য, উজ্জ্বল মুখে তাহার নিকটে বসিয়া তাহাকে কি কথা বলিতেছে...শিশু সুদেবের কলহাস্য তাহার কানে আসিতেছিল...এমন সময় প্রচন্ড একটা কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে শকট হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সুরথ চাহিয়া দেখিল, বজ্রাসনের বিরাট দুর্গ চারিদিকে তাহার পাষাণ প্রাচীরের করাল, কৃষ্ণ ছায়া বিস্তার করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। কারাগারের প্রকান্ড লৌহদ্বার বিকটরবে ঝনৎকার করিয়া খুলিয়া গেল। অপর একটি হতভাগ্যকে গ্রাস করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই বিরাট লৌহ-দানব তাহার দুই বাহু বিস্তৃত করিয়া দিল। সুরথ ভিতরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরাট দংষ্ট্রা পুনর্বার নিমীলিত হইয়া গেল। বহির্জগতের নিকটে সুরথের আর কোন অস্তিত্ব রহিল না।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

আজ ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথি। গৌড়-বঙ্গ প্রজাধিকারে আসিবার পর হইতে অভিজাত সম্প্রদায়ের যে নায়ক অথবা মহানায়কগণকে পাটলিপুত্রে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, আজ রাত্রিদ্বিপ্রহরে তাহাদের প্রাণ-দন্ডের কাল নির্ধারিত হইয়াছে। দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিবার পর হইতে এই সংবাদ বহন করিয়া দলে দলে বিদ্রোহী প্রজা মশালহস্তে পাটলিপুত্রের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের উত্তেজিত কণ্ঠের "ভীম-ভবানী!" শব্দে দিক দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। নিজগৃহের বাতায়নে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জয়ন্ত মনে মনে বলিল, "ভগবান সুগতকে অশেষ ধন্যবাদ, যে আমার কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু আজ এই ভয়ঙ্কর স্থানে উপস্থিত নেই!"

জয়ন্তের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রেমে করুণায় সমুজ্জ্বল সুনন্দার ক্ষমাসুন্দর মুখের স্নিগ্ধ ছবি ভাসিয়া উঠিল। স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনের

এই তিনটি বৎসর যে মধুর গার্হস্থ্য চিত্রটি তাহার স্বপ্নজাগরণে একমাত্র চিন্তার আশ্রয় হইয়া ছিল, তাহারই কল্পনায় জয়ন্তের সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। একখানি ক্ষুদ্র শান্তিময় নীড়—সুনন্দার শ্রীমণ্ডিত কল্যাণী মূর্তি তাহাকে অপরূপ শান্তি ও সুখে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। পুষ্পকলির মত সুন্দর একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া অসীম নির্ভরতায় সুনন্দা সুরথের প্রেমমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিয়া আছে। কন্যার পরিতৃপ্ত মূর্তির দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ উমাপতির সৌম্য মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে!...এই তিন বৎসরে যেকথা সে অন্ততঃ সহস্রবার ভাবিয়াছে, নিঃশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্ত আবার সেই কথাটিই মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "এই ভালো হয়েছে! এ-ই-ই সবচেয়ে ভালো হয়েছে! আমার ক্ষুধিত হৃদয়ের বাসনা মেটাতে গিয়ে তার সুন্দর জীবনটির সমস্ত সম্ভাবনা আমি কেমন করে বিনষ্ট করে দিতাম?"

সুনন্দার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া একটি বৎসর জয়ন্ত অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার বৃথা চেষ্টায় উত্তরাপথের সমস্ত দেশগুলি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিল। হৃদয়ের উদ্দাম নৈরাশ্য যখন কতকটা সংযত হইয়া আসিল, তখন একদিন সুনন্দার কৈশোর-স্মৃতিমণ্ডিত পাটলিপুত্রে ব্যর্থ জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইয়া দিবার একটা ব্যাকুল কল্পনা তাহাকে পাইয়া বসিল। তারপর এই দুইটি বৎসর সুনন্দার পিতৃগৃহের অতি নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করিয়া একান্ত নিঃসঙ্গতায় সে দিনের পর দিন অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিলে সে কোনদিন নন্দিকেশ্বরের মন্দিরে, কোনদিন পরিত্যক্ত শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদের সম্মুখের উদ্যানে গিয়া বসিত। দুঃখসংস্পর্শহীনা একটি অনিন্দ্য কিশোরী মূর্তি তাহার সম্মুখে যেন তখন সত্যই ঘুরিয়া বেড়াইত। কখনও বা শিশু সুনন্দার পবিত্র মুখচ্ছবি তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহার যন্ত্রণাহত হৃদয়ে অমৃতস্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যাইত। আবাল্যের প্রিয় সঙ্গী অস্ত্রসজ্জা জয়ন্ত ত্যাগ করিয়াছিল। নারীদেহের সংস্পর্শের কল্পনাতেও এখন তাহার সমস্ত দেহমন যেন শিহরিয়া উঠিত। বর্তমানে সুনন্দার স্মৃতিকে একমাত্র সঙ্গী করিয়া তাহার দিনগুলি অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটিয়া যাইতেছিল। বিদেশী

বলিয়া রাষ্ট্র-বিপ্লবে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা তাহার ছিল না। তাই এই দুর্দিনেও পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিবার কোন চেষ্টাই সে করে নাই।

রুদ্ধদ্বারে সহসা পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল করাঘাতের শব্দে আশ্চর্য হইয়া জয়ন্ত চিন্তা-তন্ময়তা ভুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এত রাত্রে এমন করিয়া কে তাহার সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিতেছে! কিন্তু দ্বার খুলিয়া তাহার অতিথিদের দেখিয়া ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় সে বিবর্ণ হইয়া গেল। যে সুখময় পরিবারটিকে এই বিপ্লব-ভীষণ নগর হইতে বহুদূরে কল্পনা করিয়া সে ক্ষণপূর্বেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, একজন ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! সর্বাগ্রে বিস্রস্ত-বসনা সুনন্দা—নিদারুণ ভয়ে ও নৈরাশ্যে, অতি ভয়ংকর দুশ্চিন্তায় তাহার আয়ত নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে। শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া সে যেন তাহার সম্মুখে কি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য অভিনীত হইতে দেখিয়া আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! তাহার পশ্চাতে শিশু সুদেবকে ক্রোড়ে লইয়া বিশ্বস্তা ধাত্রী মঙ্গলা-উমাপতি ও গৌরীপতি। সকলের আকৃতিতেই দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তি ও অপরিসীম আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। দেখিয়া নিদারুণ আশংকায় জয়ন্তের হৃৎস্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া যাইতে চাহিল। স্খলিতস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "সুনন্দা দেবী! কি এ! আপনি এ সময়ে এখানে? মহাশ্রেষ্ঠী! সামন্ত গৌরীপতি! কি হয়েছে? এই দুর্দিনে কেন আপনারা উজ্জয়িনীর নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন?"

স্ফুট-কমলের মত দুটি কর যুক্ত করিয়া সুনন্দা রুদ্ধস্বরে বলিল, "ভদ্র, আমার স্বামী—"

—"সুরথ? কোথায় সে? কি হয়েছে তার?"

—"তিনি পাটলিপুত্রে—"

বজ্রাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া জয়ন্ত বলিয়া উঠিল, "পাটলিপুত্রে? সর্বনাশ! এই বিপ্লবের দিনে পাটলিপুত্রে সে কেন এসেছে?"

রুদ্ধস্বর কোন মতে পরিষ্কার করিয়া সুনন্দা বলিল, "এক সপ্তাহ পূর্বে সিংহশীলায় কারারুদ্ধ তাঁদের এক পূর্বতন কর্মচারীর পত্র পেয়ে তাকে উদ্ধার করতে তিনি পাটলিপুত্রে এসেছিলেন। নগরে প্রবেশ করার পূর্বে তোরণদুর্গেই তিনি নূতন প্রতীহারের আদেশে বন্দী হন। বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, বজ্রাসনের দুর্গে বিচারের প্রতীক্ষায় তাঁকে কারারুদ্ধ

করে রাখা হয়েছে। এ সংবাদ পেয়েই আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে চলে এসেছি। ভদ্র, তাঁকে উদ্ধার করবার কি উপায় হবে?"

—"বজ্রাসনের কারাগারে?" দুই হাতে ললাট টিপিয়া ধরিয়া জয়ন্ত সেখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া গৌরীপতি দ্রুতস্বরে বলিলেন, "জয়ন্ত! তুমি কি জান, শীঘ্র বল! বজ্রাসনের একটি বন্দীও কি আর বেঁচে নেই?"

—"এখনও হয়তো আছে, কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকবে না। আজ মধ্যরাত্রে কালিকার মহাশ্মশানে তাদের প্রাণদণ্ডের কাল নির্ধারিত হয়েছে। আর প্রাণদণ্ড? দণ্ডই বা কোথায়? কারাগার পরিত্যাগ করা মাত্র ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণে হতভাগ্য বন্দীদের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! সুনন্দা —সুনন্দাদেবি, কেন আপনি সুরথকে এই বিপ্লবের সময় পাটলিপুত্রে আসতে দিয়েছিলেন? কেন আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার পথরোধ করেননি? উন্মত্ত জনসঙ্ঘের ক্রোধ থেকে এখন সুরথকে কে উদ্ধার করবে?"

উমাপতি নিবিষ্টমনে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখে নৈরাশ্য বা অধীরতার কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। স্থিরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সব কথা আমাদের একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল, জয়ন্ত। কেন সুরথের জীবনের আশা নেই? সে তো নিজে কোন অপরাধ করেনি?"

—"মহাশ্রেষ্ঠী, পাটলিপুত্রের গত কয়েক মাসের ঘটনা যে নিজে প্রত্যক্ষ করেনি, সমস্ত ব্যাপারটা ধারণা করা তার পক্ষে অসম্ভব। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে জনসম্প্রদায় শত অত্যাচার সহ্য করেও মূক হয়ে ছিল, তাদের মধ্যে যে এত প্রতিহিংসা, এত উন্মত্ত ক্রোধ সঞ্চিত হয়ে ছিল, সে কথা কে কবে জানত? মহীপালদেব ও তাঁর প্রমোদসঙ্গী মহানায়কবর্গের বিলাস-লীলার কেন্দ্রস্থল ছিল এই পাটলিপুত্র, তাই এ নগরের জনসাধারণের জিঘাংসা প্রবৃত্তি যেন গৌড়-বঙ্গের অন্যসকল স্থানকে অতিক্রম করে গেছে। মগধের উপরে পালসাম্রাজ্যের অধুনা-বিলুপ্ত অধিকারের শেষ স্মৃতি বলেই হয়তো বিগ্রহপালদেব ও মহীপালদেব পাটলিপুত্রকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নগররূপে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভারতের এই পূর্বতন রাজধানীকে পুনর্বার সৌভাগ্যশ্রীতে মণ্ডিত করে তুলে উত্তরাপথের সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে মহোদয় হতে পাটলিপুত্রে আর একবার

ফিরিয়ে আনবার ক্ষীণ আশাও তাঁরা মনে মনে পোষণ করেছিলেন। কিন্তু পুরাতন পাটলিপুত্রের নবপ্রতিষ্ঠিত অংশে গৌড়ীয় স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে প্রাসাদমালা ধীরে ধীরে নির্মিত হয়ে উঠছিল, মহীপালদেবের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারে প্রজাদের চোখে তার প্রতিটি ইষ্টকখণ্ড অত্যাচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাটলিপুত্র থেকে রাজবংশ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে দিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে—অত্যাচারের স্মৃতিজড়িত এই নগরের অস্তিত্বও তারা আর রাখবে না। একপক্ষ পূর্বে নব গৌড়াধিপের ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে, অভিজাতবংশীয় যে-কোন ব্যক্তি এই নগরে প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণদণ্ড হবে। এ আদেশের পরে মহানায়ক-বংশীয় কোন বন্দীর জন্য সামান্য চেষ্টাও পাটলিপুত্রে কেউ করবে না। সুরথের জীবনের কোন আশাই আমি আর করতে পারছি না।”

সুনন্দার মুখের উপরে মৃত্যুতুল্য বিবর্ণতা ছড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া উমাপতি তাহাকে সস্নেহে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি তখন এক অননুভূতপূর্ব দৃঢ়তায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “সুরথের উদ্ধারের উপায় আমার হাতে আছে, সেজন্য আমি ভয় করিনে! সুনন্দা, তুমি এত কাতর হয়ো না, নারায়ণে বিশ্বাস রেখে একটু স্থির হও! গৌরী, তুমি সুদেব ও সুনন্দাকে নিয়ে আমার পুরাতন প্রাসাদে গিয়ে অপেক্ষা কর, সুনন্দা যাতে বেশী অধীর হয়ে না পড়ে তাই একটু দেখো। আমি এখনই একবার বর্তমান মহাপ্রতীহার ও নগরাধ্যক্ষের নিকটে যাচ্ছি, আমার ফিরতে বিলম্ব হলে তোমরা ভয় পেয়ো না।”

জয়ন্তের মুখ দুর্বিষহ নৈরাশ্যে পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। ঈষৎ নিম্ন-কণ্ঠে সে বলিল, “মহাশ্রেষ্ঠী, যে আশা সফল হওয়ার নয়, কেন আর তার ভরসা ওঁকে দিচ্ছেন? আজ রাত্রে পাটলিপুত্রের রাজপথে কারুর জীবন নিরাপদ নয়। অনর্থক মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরে আপনার প্রাণ বিপন্ন করবেন না। বজ্রাসনের দুর্গে যখন সুরথকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তখন তাকে উদ্ধার করার ক্ষমতা স্বর্গের দেবতাদেরও নেই।”

উমাপতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আমার প্রাণ কেন বিপন্ন হবে জয়ন্ত? পাটলিপুত্রের অন্ধকূপে সতেরো বৎসর

বিনাবিচারে আমি বন্দী হয়ে ছিলাম, একথা জানলে শুধু এ নগরে কেন—সমগ্র গৌড়-বঙ্গে এমন প্রজা নেই, যে আমার সামান্য ইচ্ছা পালন করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হবে! আমার জীবনের যে ঘটনাকে আমি এতদিন দুঃসহ অভিশাপ বলে মনে করে এসেছি, আজ তা-ই আমার কন্যার পক্ষে সবচেয়ে বড় মঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পূর্ব-বন্ধনদশার গ্লানি আমাকে যে শক্তিদান করেছে, তার সহায়তাতেই সুরথের বন্দী হওয়ার সংবাদ আমি লাভ করতে পেরেছি। এই শক্তিবলে আমার জামাতাকে উদ্ধার করে আনাও আমার পক্ষে কঠিন হবে না। সুনন্দা, আমার কথা বিশ্বাস কর মা, তোমার স্বামীকে আমি তোমার কাছে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে এনে দেব। নগর আজ যখন এত বিপদ-সঙ্কুল, তোমাদের আর আজ রাত্রে অন্যত্র যেয়ে কাজ নেই। একটি রাত্রির জন্য জয়ন্ত, তোমার গৃহেই এদের রাখ। কিন্তু আর বিলম্ব করলে ক্ষতি হতে পারে—আমি তাহলে এবার যাই।"

সুনন্দার অবনত মস্তকে একবার সস্নেহে হস্ত অর্পণ করিয়া উমাপতি দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুক্তদ্বারপথে জয়ন্ত চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধের দেহে যেন অযুত হস্তীর বল ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার আকৃতির প্রতি রেখায় যে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্ত ভাবিল, "উমা-পতির কথা যদি সত্য হয়, ভালোই—কিন্তু যদি তা না হয়, তবে ?..."

* * * *

জনপূর্ণ রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ দিয়া উমাপতি প্রচণ্ডবেগে বজ্রাসনদুর্গের অভিমুখে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। পাছে তিনি দুর্গদ্বারে গিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি নিঃশ্বাস ফেলিতেও পারিতে-ছিলেন না। দূর হইতে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন, নানা স্থান হইতে দলে দলে মশালধারী প্রজা উত্তেজিত কলরব করিতে করিতে শ্মশানের দিকে চলিয়াছে। মশালের রক্তিম আলোকে তাহাদের আরক্ত, কঠিন চক্ষুর দিকে চাহিয়া উমাপতির বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইতেছিল। আরও দ্রুত গতিতে গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিবার জন্য ক্লান্ত অশ্বকে তিনি অধিকতর তাড়না করিতেছিলেন।

বজ্রাসনদুর্গের সম্মুখে যখন তিনি গিয়া পৌঁছিলেন, তখন দুর্গদ্বারে জনতা সমবেত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আসন্ন হত্যাযজ্ঞের জন্য তখন সকলেই উৎসুক—দুর্গরক্ষকের সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিয়া উমাপতির কম্পিত কণ্ঠের বারম্বার কাতর মিনতি কোন প্রহরী কানেও তুলিল না। অগত্যা উদ্বেল হৃদয়কে কোনমতে শান্ত করিয়া উমাপতি দুর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রির অন্ধকার বক্ষঃ চিরিয়া দূরে দামামা বাজিয়া উঠিল। শ্মশান হইতে বহু সম্মিলিত কণ্ঠের হুহুংকার ও জয়ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের চারিদিকে শত শত মশাল জ্বলিয়া উঠিল। উমাপতি বুঝিতে পারিলেন, অন্যান্য কারাগার হইতে বলি সংগ্রহ করিয়া জনসঙ্ঘ বজ্রাসন-দুর্গের দিকে আসিতেছে।

চীৎকার, হুঙ্কার ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে সেই জনতা ক্রমে উমাপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জনারণ্যের মধ্য হইতে একজন পুরুষকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "দুর্গরক্ষক কোথায়? আমরা বন্দী-দের চাই!" সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে সেই উন্মত্ত চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, "আমরা বন্দীদের চাই!" কম্পিত হৃদয়ে দুর্গরক্ষক দ্বার খুলিতে আদেশ দিল। প্রহরীবেষ্টিত হইয়া একে একে ছাব্বিশজন বন্দী তোরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দেখিয়া একজন অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিয়া জনতার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াই-লেন। দুর্গরক্ষক একে একে বন্দীদিগকে তাহাদের পরিচয়সহ তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিয়া দিতে লাগিল। উমাপতি দেখিলেন, এইবার তাঁহার সুযোগ আসিয়াছে। একলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি জনতার সম্মুখীন হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ! অত্যাচার ও অবিচার পৃথিবী থেকে দূর করে দিয়ে আজ যে নূতন সমাজ তোমরা গড়তে চলেছ, তার ভিত্তিস্থাপন কি তোমরা নিরপরাধের রক্তপাতে করতে চাও?"

অকস্মাৎ এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জনসঙ্ঘ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। চারিদিকে উত্তেজিত প্রতিবাদের একটা বিরাট কলরোল উত্থিত হইল। স্পর্ধিত উমাপতিকে যেন শত শত নখে, দন্তে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে তখন তাহাদের আক্রোশ মিটিত। দেখিয়া অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ

উমাপতিকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া আসিতে প্রহরীদের ইঙ্গিত করিলেন। উমাপতি তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি চাও?"

নির্ভীক হৃদয়ে উমাপতি উত্তর করিলেন, "আমার নাম উমাপতি, আমি একজন গৌড়ীয় শ্রেষ্ঠী। আজ যে বন্দীদের আপনারা বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছেন, তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তি আছে। তাই, পাটলিপুত্রের জনসম্প্রদায়ের নিকটে আমি তার হ'য়ে বিচার প্রার্থনা করতে এসেছি।"

সৈনিকপুরুষ বিস্মিত হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি উমাপতি শ্রেষ্ঠী? আপনিই না সতেরো বৎসর এক মহানায়কের নিষ্ঠুর চক্রান্তে পাটলিপুত্রের অন্ধকূপে বন্দী হয়ে ছিলেন? তবে যে আমরা শুনেছিলাম, এই দীর্ঘ কারাবাসের ফলে উমাপতি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন?"

উমাপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সংবাদ মিথ্যা নয়। সত্যই আমি অর্ধোন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কন্যা এবং দুইজন অকৃত্রিম বন্ধুর সাহায্যে আমি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছি।"

ক্ষণপূর্বের উন্মত্ত জনসঙ্ঘ যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। উমাপতি অন্ধকূপে বন্দী ছিলেন, এ সংবাদ এক মুহূর্তে তাহাদের সকল ক্রোধ হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের দিকে ফিরিয়া উমাপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার সেই অকৃত্রিম বন্ধুদ্বয়ের একজন আজ বিনাপরাধে বধ্যভূমিতে নীত হতে চলেছেন—তাঁর জীবনভিক্ষাই আজ আমি তোমাদের কাছে করতে এসেছি। আমি যাঁর কথা তোমাদের বলছি, তিনি স্বয়ং অভিজাতবংশীয় হলেও জনসাধারণের প্রতি অভিজাতসম্প্রদায়ের মনোভাব তিনি কোনদিনই পোষণ করেননি। প্রজাবৃন্দের ওপরে অত্যাচার-প্রসূত তাঁর পিতৃবংশের যে অতুল সম্পত্তি, তার একটি কণাও ভোগ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে গৌড় ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে তিনি দীনভাবে জীবনযাপন করছিলেন। নাগরিকগণ, সাত বৎসর পূর্বে আমি যখন উন্মাদ অবস্থায় পাটলিপুত্র হতে উজ্জয়িনীতে নীত হই, তখন তাঁর সাহায্য না পেলে আমি ও

আমার কন্যা কিছুতেই এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এত দূরদেশে যেতে সমর্থ হতাম না। রুগ্নাবস্থায় তিনি ছিলেন আমার একমাত্র সুহৃদ, প্রবাসে তিনিই ছিলেন আমার স্নেহশীল সঙ্গী ও আশ্রয়! এই বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ তোমরা আমাকে শোধ করতে দাও! সপ্তদশ বর্ষ বিনাবিচারে কারারুদ্ধ থাকার জন্য স্বদেশবাসীর করুণার ওপরে যদি বিন্দুমাত্র অধিকার আমার জন্মে থাকে, তবে সেই দাবীতে আমার সুহৃদের জীবন আমি ভিক্ষা করছি। এই মহৎহৃদয় যুবককে তোমরা আমার কাছে ফিরিয়ে দাও!”

জনতার মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, “অন্ধকূপের বন্দীকে যিনি মুক্তিলাভে সাহায্য করেছেন, তিনি যে সম্প্রদায়-ভুক্তই হোন না কেন, তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁকে মুক্তি দিতে আমাদের আপত্তি কেন হবে?” শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে শত শত কণ্ঠ তুমুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। শত শত কণ্ঠ আগ্রহভরে সেই বন্ধুর নাম জানিতে চাহিতে লাগিল। সেই জয়ধ্বনিতে ভরসা পইয়া উমাপতি বলিতে লাগিলেন, “তিনি বজ্রাসন দুর্গের একজন বন্দী, তাঁর নাম সুরথদেব—তিনি আমার সুহৃদ শুধু নন, আমার জামাতা—আমার এক-মাত্র কন্যা ও স্নেহের পুত্তলি সুনন্দার প্রিয়তম স্বামী—সংসারে আমার একমাত্র আশ্রয়। মহানায়ককুলে জন্ম তাঁর একমাত্র অপরাধ, কিন্তু স্বেচ্ছা-বৃত দারিদ্র্য ও সম্ভ্রান্তবংশের সকল দাবীত্যাগও কি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে উঠতে সক্ষম হয়নি? নাগরিকগণ, মহানায়ক সম্প্রদায়ের অত্যাচারে আমার জীবনের প্রথমার্ধের সমস্ত শান্তি আমি হারিয়েছি। এই অভিশপ্ত জীবনের শেষাংশের একমাত্র আশ্রয় তোমরা আর হরণ করে নিও না। সুরথদেবের কোন অপরাধ নেই, একথা আমি ভালো করেই জানি। তবু যদি তাঁর জন্মের কোন ক্ষমা তোমাদের কাছে না থেকে থাকে, শুধু আমার কথা স্মরণ করে তোমরা তাঁকে মুক্তি দান কর।”

উমাপতির মিনতির মধ্যে যে নিদারুণ যন্ত্রণার স্মৃতি নিরুদ্ধ ছিল, তাহার ইঙ্গিতে তাঁহার শ্রোতাদের অনেকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সকল উন্মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উমাপতি ও সুরথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একবার দুর্গরক্ষকের—একবার অশ্বারোহী সৈনিকের নিকট বন্দীর জীবনভিক্ষা করিতে লাগিল। জনসম্প্রদায়ের অনুরোধ

অবহেলা করিবার শক্তি বা সাহস সে যুগে কোন কর্মচারীরই ছিল না। তদুপরি উমাপতির জীবনকাহিনী সৈনিক এবং দুর্গরক্ষকের পাষাণ হৃদয়েও রেখাপাত না করিয়া পারে নাই। তাঁহাদের ইঙ্গিতে প্রহরীর দল সুরথের শৃঙ্খল খুলিয়া লইয়া তাহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরথ কম্পিতপদে দুর্গপ্রাকারের বাহিরে আসিয়া পেঁৗছিতে না পেঁৗছিতে ক্ষুধিত হৃদয়াবেগে জনতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পূর্বেও যাহারা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্য দেখিয়া নিজেদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই এখন উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল। সুরথের অনাহার-ক্লিষ্ট, শারীরিক ও মানসিক বিপ্লবে অবসন্ন দেহ এই উচ্ছ্বাস সহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও জনতা তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। কয়েকজন কোথা হইতে একটা অশ্বশকট টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া প্রস্তাব করিল, অশ্বের পরিবর্তে তাহারা নিজেরাই সুরথ ও উমাপতিকে উহাতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। উমাপতির সনির্বন্ধ উপরোধে কেহ কর্ণপাত করিল না। একদিকে সেই বিরাট জনস্রোতের এক অংশ পূর্বের ন্যায় হিংস্র উল্লাসে গগন বিদীর্ণ করিয়া অন্যান্য বন্দীদিগকে ঘিরিয়া লইয়া শ্মশানের দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপর দিকে তাহারই একটি অংশ তুমুল জয়ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া সদ্যমুক্ত সুরথ ও উমাপতিকে তাঁহাদের বাটির দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বহু দুঃখের পর পুনর্বার সম্মিলিত ক্ষুদ্র পরিবারটির পরস্পর সুখদুঃখের আলোচনা তখনও শেষ হইতে পারে নাই। জয়ন্তের গৃহে একটি কক্ষে সুরথকে ঘিরিয়া বসিয়া সুনন্দা, উমাপতি ও গৌরীপতি মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিলেন। জয়ন্ত অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিল।

সমূহ মৃত্যুর কবল হইতে উমাপতি কেমন করিয়া সুরথকে ছিনাইয়া আনিয়াছেন, সে কথা শুনিতে শুনিতে সুনন্দা বার বার শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার ভীত, পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া উমাপতি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সস্নেহ তিরস্কারের ছলে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। অপরিসীম পরিতৃপ্তি তাঁহার সমস্ত আকৃতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে দুর্ভাগ্য তাঁহার জীবনে সমস্ত গ্লানির আধার হইয়া ছিল, তাহারই সাহায্যে কন্যার অপরিমেয় স্নেহের ঋণ কতকটা শোধ করিতে পারিয়া তাঁহার দেহে ও মনে যেন নবশক্তি ও গৌরব জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত বিপদ অন্যান্য সকলের মত তাঁহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না করিয়া বরং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়া দিয়াছিল। উমাপতি সত্যই যেন ইহার মধ্য দিয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু উমাপতি বা গৌরীপতির মত সুনন্দা কিছুতেই সুরথের বিষয়ে এখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উমাপতির সহস্র অনুযোগও তাহার সে আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। কোথাও সামান্য একটু শব্দ হইলেই সে চমকিয়া উঠিয়া কাতর দৃষ্টিতে পিতার হস্ত চাপিয়া ধরিতেছিল। শেষরাত্রির দিকে বহির্দ্বারের নিকটে কি একটা শব্দ শুনিয়া তাহার আশঙ্কা আর বাধা মানিল না। আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্র তুলিয়া সে সুরথ ও উমাপতিকে কি কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কম্পিত কণ্ঠ দিয়া কোন স্বর বাহির হইল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া উমাপতি হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার ভয় কি আর কিছুতেই আজ কাটবে না, সুনন্দা? কেন অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ, বলো তো মা? আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, সুরথকে উদ্ধার করে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেব—আমার কথা কি আমি রাখিনি? তবে আর এখন তোমার ভয় কি মা? আর সামান্য একটু অপেক্ষা কর। রাত্রি প্রভাত হলেই সুরথকে নিয়ে আমরা পাটলিপুত্র ত্যাগ করে যাব। তখন তোমার কোন আশঙ্কার কারণ আর থাকবে না। এই সময়টুকু তোমার বাবার ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করে থাক মা!"

তাঁহার কথায় যে গর্বিত আনন্দ প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটুকু লক্ষ্য করিয়া সুরথের রক্তহীন অধরেও একটি হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। সুনন্দা

লজ্জিতভাবে কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু উমাপতির কথা সমাপ্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কক্ষদ্বারে অস্ত্রের ঝনৎকার ও বহুলোকের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সুনন্দা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সুরথের দিকে অগ্রসর হইতে না হইতে দ্বার খুলিয়া কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। উমাপতি তাহাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সৈনিকদিগকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও? বিনানুমতিতে এ গৃহে কেন প্রবেশ করেছ?"

সৈনিকদের মধ্য হইতে একজন উত্তর দিল, "মহানায়ক দুর্জয়দেবের পুত্র ও বিগ্রহদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরথদেবকে আমরা চাই। বজ্রাসনের দুর্গ থেকে নগরমুখ্যের আজ্ঞাপত্র নিয়ে আমরা এসেছি, সুরথদেবকে এখনই আমাদের বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে। আগামী কল্য দিবসের প্রথম প্রহরে নগরমুখ্যের সম্মুখে তাঁর বিচার হবে, স্থির হয়েছে।"

উমাপতি বিমূঢ়ভাবে বলিলেন, "কিন্তু নাগরিকগণের সম্মতিক্রমে আজ রাত্রেই যে আমি বজ্রাসন দুর্গ থেকে সুরথদেবকে উদ্ধার করে এনেছি! ভদ্র, তোমার কোন ভুল হয়নি তো?"

প্রথম সৈনিক শির সঞ্চালন করিয়া বলিল, "না মহাশ্রেষ্ঠী, কোন ভুল আমার হয়নি। সুরথদেবের মুক্তির সময়ে আমিও তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম! আপনারা চলে আসার প্রায় একপ্রহর পরে নূতন দুটি অভিযোগপত্র নগরমুখ্যের নিকটে পৌঁছায়। সেই পত্র পেয়ে তিনি পুনর্বার সুরথদেবকে বন্দী করতে আজ্ঞা দিয়েছেন।"

কিছুক্ষণ উমাপতির আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁহাকে যেন অকূল সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। সুনন্দার মুখের ক্রম-বর্ধমান পাণ্ডুরতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. "এই অভিযোগপত্র দুটি কার কার প্রেরিত, তুমি জানো?"

সৈনিক কিছু বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর অনিচ্ছুক কণ্ঠে বলিল, "অভিযোগপত্র-প্রেরকের নাম প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, তবু আপনি জিজ্ঞাসা করছেন তাই বলছি—একটি পত্রের প্রেরয়িতা স্বয়ং পাটলিপুত্রের মহাপ্রতীহার মহাসেনাপতি সহদেব।"

উমাপতি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আর দ্বিতীয়টি?"

সৈনিকের মুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের চিহ্ন অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিল। উমাপতির দিকে চাহিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠী কি সত্যিই আমার নিকট থেকে তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর চাচ্ছেন?"

বিস্মিত হইয়া উমাপতি বলিলেন, "নিশ্চয়ই!" পুনরায় কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া সুরথের হস্তে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে দিতে সৈনিক নতমুখে বলিল, "তাহ'লে কাল প্রাতে নগরমুখ্যের সভায় এর উত্তর পাবেন। আজ আর আমার কিছু বলবার নেই।"

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

মহানায়কসম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যাচারী-শ্রেষ্ঠ বলিয়া দুর্জয়দেব ও বিগ্রহদেবের নাম অধিকাংশ লোকের নিকটেই সুপরিচিত ছিল। নগরমুখ্য মহাসামন্ত নাগসেনের সম্মুখে তাঁহাদের একমাত্র বংশধর সুরথদেবের বিচার হইবে, এ সংবাদ শুনিয়া পরদিন প্রভাতে বিচার-সভায় জনতা যেন ভাঙিয়া পড়িল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচার আরম্ভ হইল। নগরমুখ্যের ইঙ্গিতে বজ্রাসনের দুর্গরক্ষক রুদ্দক দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, "মহাসামন্ত, বরেন্দ্রভূমির দেববংশীয় মহানায়ককুলের অত্যাচারের ইতিহাস আপনার অবিদিত নয়। এই বংশের একমাত্র সন্তান সুরথদেব একসপ্তাহ পূর্বে নগরে প্রবেশ করতে গিয়ে পশ্চিমতোরণে বন্দী হয়ে বজ্রাসন দুর্গে প্রেরিত হ'ন। গতকাল সন্ধ্যায় নাগরিকগণের অনুরোধে তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে দুইজন প্রধান নাগরিক পুনরায় তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করাতে আপনার অনুমতি নিয়ে কাল রাত্রেই তাঁকে পুনর্বার কারারুদ্ধ করা হয়েছে। ন্যায়বিচারের জন্য তাঁকে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করছি, অভিযোগপত্রগুলির যুক্তিযুক্ততা বিচার করে আপনি তাঁর দণ্ড বা মুক্তি বিধান করুন।"

রুদ্দক অভিযোগপত্রগুলি নগরমুখ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। অবিচলিত, স্থির দৃষ্টিতে রুদ্দকের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বন্দীর বিরুদ্ধে যাঁরা এই অভিযোগ আনয়ন করেছেন, তাঁদের নাম?"

সমস্ত সভা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, রুদ্দক বলিতেছে, "প্রথম অভিযোগ-পত্রের প্রেরক স্বয়ং মহাপ্রতীহার মহাসেনাপতি স্বনামখ্যাত সহদেব। দ্বিতীয় অভিযোগকারীও পাটলিপুত্রের নাগরিকসমাজে অতিশয় সুপরি-চিত—তাঁর নাম উমাপতি শ্রেষ্ঠী। অত্যাচারের জন্য প্রসিদ্ধ অভিজাতবংশের প্রতিনিধি হিসাবে বন্দী প্রাণদণ্ডার্হ—এই-ই তাঁদের অভিযোগপত্রের মূল সূত্র।"

রুদ্দকের কথা শুনিয়া সভামণ্ডপ দেখিতে দেখিতে উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। উমাপতির মুখ দুর্গরক্ষকের উত্তর শুনিতে শুনিতে বিবর্ণ পাণ্ডুরতা ধারণ করিয়াছিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "মহাসামন্ত, এ মিথ্যা অভিযোগপত্র কার জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফল, সেকথা আমি জানতে চাই! আমার কন্যাজামাতার সুখ আমার কাছে পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে বড়! সুরথ আমার জামাতা—আমার অতিশয় স্নেহের পাত্র। তার বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আমি আনয়ন করেছি, একথা যে বলে, সে মিথ্যা কথা বলে! আমার কন্যার সুখের হন্তারক হতে আমি চাইব, এ কি কখনও সম্ভব?"

ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে উমাপতির দিকে চাহিয়া নগরমুখ্য বলিলেন, "কেন, সম্ভব হবে না, মহাশ্রেষ্ঠি? আপনি গৌড়ীয় সাধারণ সমাজের একজন প্রসিদ্ধ নাগরিক, দেশের মঙ্গলের জন্য অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে আপনি কন্যাকে বিসর্জন দিতেও সক্ষম হবেন, এটাই তো আপনার পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমরা আশা করি! যাক, আপনি অনর্থক উত্তেজিত হবেন না। অভিযোগের পূর্ণ বিবৃতি মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তারপরেও যদি আপনার নামীয় পত্র মিথ্যা বলে আমার বিশ্বাস হয়, তাহলে তখন প্রতিবাদ করবেন।"

উমাপতি আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে যে মহাপ্রলয় তাঁহাকে গ্রাস করতে ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সভামণ্ডপে প্রবেশপথের একপার্শ্বে যেখানে অপরাধমঞ্চে শৃঙ্খলিত সুরথ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অতি নিকটে উমাপতি এবং অপর পার্শ্বে কিছুদূরে গৌরীপতি ও সুনন্দা নীরবে পরবর্তী মুহূর্তগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সহদেব তাঁহাদের কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার ভাবহীন মুখ ও বহুদূরে সংস্থাপিত দৃষ্টির শূন্যতা দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন এই সভামণ্ডপে উপস্থিত উত্তেজিত জনতা, হতভাগ্য বন্দীর স্থির পাণ্ডুর মূর্তি, তাহার আত্মীয়গণের ব্যাকুলতা—সকল কিছু অতিক্রম করিয়া সুদূর অতীতের ঘটনাবলীর পুনরাভিনয়ই কেবল প্রত্যক্ষ করিতেছে। সুরথ তাহার নিকট সেই অতীতের প্রতীক, এই বিচারসভা উপলক্ষ্যমাত্র—সমবেত জনতা কেবল তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়। উজ্জ্বল চক্ষুর নিষ্পলক, স্থির দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ রাখিয়া অনুত্তেজিত. গভীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "বন্দী সুরথদেবের বিরুদ্ধে আমার যা অভিযোগ, উমাপতি শ্রেষ্ঠীর পত্রেই তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। মহাশ্রেষ্ঠীর অভিযোগ-পত্রটি নূতন নয়, প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে এই নগরেই এক অন্ধকূপে আবদ্ধ অবস্থায় তিনি এটি রচনা করেছিলেন। আমি কেবল উপযুক্ত স্থানে এ-পত্র পেশছে দেবাব উপলক্ষ্য হয়েছি।"

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সহদেব পুনরায় বলিতে লাগিল, "বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় অন্ধকূপগুলি ধ্বংস কববার ভার যখন আমার উপরে পড়ে, তখনই এ পত্র আমার হাতে এসেছিল। আমি জানতাম. নির্জনে দীর্ঘ কারাবাসের দণ্ড প্রাপ্ত হ'লে অনেক বন্দীই তাদেব অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী কোন না কোন উপায়ে লিপিবদ্ধ করে রেখে যেতে চেষ্টা করে। তাই কৌতূহলপরবশ হয়ে অন্ধকূপগুলিতে অগ্নিসংযোগ করবার পূর্বে আমি গোপনে প্রত্যেকটি ভূগর্ভে প্রোথিত কারাগৃহ অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম। উমাপতি শ্রেষ্ঠী কোন্ কক্ষটিতে অবরুদ্ধ ছিলেন তা আমি জানতাম। বিশেষ যত্নে সে কক্ষটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে গিয়ে প্রস্তরখণ্ডের নীচে এই ভূর্জপত্রগুলি আমি পেয়েছিলাম।"

দুর্গরক্ষকের প্রসারিত হস্ত হইতে বিবর্ণ পত্রগুলি লইয়া সহদেব বলিল, "আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। আমার যা বক্তব্য. এই ভূর্জপত্রগুলি আমার চেয়ে ভালো করেই সে কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। উমাপতি শ্রেষ্ঠীর হস্তাক্ষর আমি চিনি। এ লিপি যে তাঁর

স্বহস্তলিখিত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আলোকসংস্পর্শহীন অন্ধকারে শুদ্ধমাত্র নখরের সাহায্যে বুকের রক্ত চিরে, এই অভিযোগপত্র উমাপতি রচনা করেছিলেন। অসহায় অক্ষমের সেই রক্তলিপ্ত পত্রের দাবীতে আমি আজ ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে বন্দীর মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করছি।"

সমবেত জনতা চাঞ্চল্য ভুলিয়া পূর্ণ নিস্তব্ধতায় সহদেবের কথা শুনিতেছিল। নগরমুখ্যের ইঙ্গিতে একজন লিপিকার ভূর্জপত্রগুলি তুলিয়া লইয়া পড়িলঃ—

"সাং ৫২৯, আমার কারাবাসের দশম বৎসর। আমি তাম্রলিপ্তির একজন শ্রেষ্ঠী, আমার নাম উমাপতি। অন্ত্যজ-জাতীয়া একটি রমণীর প্রতি জঘন্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এই স্পর্ধার জন্য মহানায়ক দুর্জয়দেব ও তাঁহার ভ্রাতা বিগ্রহদেবের আদেশে আমি দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ এই জীবন্ত সমাধিতে প্রোথিত হইয়া আছি। আরও কতদিন এভাবে থাকিব—জীবনে আর কোনদিন মুক্তি পাইব কিনা, তাহা আমি জানি না। দুশ্চিন্তায়, অনাহারে, অস্বাস্থ্যকর কারাবাসে আমার শরীর মন ক্রমে ভাঙিয়া পড়িতেছে। আর বেশীদিন এভাবে আবদ্ধ থাকিলে আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কয়েকদিন যাবৎ এই আশঙ্কাই আমার হইতেছে। দুইদিন পূর্বে কারাগৃহে একটি প্রস্তরের নীচে কতগুলি ভূর্জপত্র আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি। সম্ভবতঃ আমার পূর্বে যে হতভাগ্য এ অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিল, সে কোন উপায়ে ইহাদের এই স্থানে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সম্পূর্ণ-রূপে জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে আমি আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী একটু একটু করিয়া ইহাদের গায়ে লিখিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। আজ বিনা বিচারে আমার প্রাণশক্তি ভূগর্ভের অন্ধকারে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমার মৃত্যুর পূর্বে বা পরে এই পত্রগুলি যদি কেহ খুঁজিয়া পায়, তবে হয়তো আমার আত্মীয় এবং বন্ধুগণ আমার সংবাদ পাইবে—এই আশায় আমি এ-পত্র রচনা করিতেছি।...

এই আলোক-চিহ্নহীন কারাগারে লিপিরচনা প্রায় অসম্ভব, লিখিবার কোন উপকরণও আমার নাই। তবুও বুকের রক্ত দিয়া, নখরের সাহায্যে, অন্ধকারে চোখের তারা বিস্ফারিত করিয়া একটু একটু করিয়া আমার বক্তব্য আমি লিখিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি। দশবৎসর পূর্বে সুবর্ণদ্বীপে

বাণিজ্যযাত্রার আয়োজনে আমি যখন ব্যাপৃত ছিলাম, তখন একদিন গভীর রাত্রে নির্জন পল্লীর নিকট দিয়া ফিরিবার পথে রমণীর কাতর-কণ্ঠের আর্তনাদ শুনিয়া নিকটবর্তী একটি অর্ধ-ভগ্ন গৃহে আমি প্রবেশ করি। গৃহে প্রবেশ করিয়া যে মর্মান্তিক দৃশ্য আমার চোখে পড়িয়াছিল, আজ এই দশবৎসরের কারাবাসও তাহার স্মৃতি আমার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই! সিক্ত মৃত্তিকার উপরে যে অর্ধমূর্চ্ছিত নারীদেহ লুটাইতেছিল, নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। নিমেষের দৃষ্টিপাতেই আমি বুঝিতে পারিলাম, রমণীর অসাধারণ রূপলাবণ্যই তাহাকে এই দারুণ দুর্দশায় টানিয়া আনিয়াছে—তাহার দেহে প্রথম মাতৃত্বের যে সম্ভাবনা-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও হতভাগিনীকে সে চরম সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। নিকটে একটি কিশোর বালকের মৃতদেহ আপাদমস্তক রক্তে প্লাবিত হইয়া পড়িয়া ছিল। রমণীর সহিত তাহার মুখাবয়বের সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমানে বুঝিলাম, বালক তাহার ভগ্নীকে রক্ষা করিতে গিয়া অত্যাচারীর হাতে প্রাণ দিয়াছে! রমণীর যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি শুনিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছি, এমন সময় দুইজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি সে গৃহে প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা পরুষকণ্ঠে অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু হতভাগিনী নারীর কাতরোক্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, তাই আমার বিপদ বুঝিয়াও আমি তাহাদের আদেশ পালন করিতে পারিলাম না।...

আমার শক্তি দিনে দিনে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। ভূর্জপত্রও আর বিশেষ অবশিষ্ট নাই। সেদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের সেই দুইটি ব্যক্তির—বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কটির মুখে যে নির্লজ্জ লোলুপ লালসা এবং প্রজাসাধারণের প্রতি অপরিসীম তাচ্ছিল্য ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি কোনদিন ভুলিতে পারিব না। উত্তপ্ত বাদানুবাদের মধ্য দিয়া তাহারা বারম্বার এই কথাটিই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, যে রমণীর দুর্দশা দেখিয়া আমি এতটা উত্তেজিত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছি, সে অন্ত্যজজাতীয়া এক মৎস্য-ব্যবসায়ীর কন্যা মাত্র—সুতরাং তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভূস্বামীর ন্যায্য

দাবী মিটাইতে আসিয়া তাহার যদি মৃত্যুও হয়, তবে তাহাতে বাস্তবিক বিচলিত হওয়ার কোন কারণ আমার নাই! কোন্ দেশাচার, কোন্ রাজ-ধর্ম এই অধিকার তাহাদের দিয়াছিল, জানি না—কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া আমি তাহাদের মুখে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের এই বিবৃতি শুনিলাম! আমার মুখ দেখিয়া আমার অন্তরের ভাব বোধ হয় তাহারা অনুমান করিয়াছিল। তাই, আর একমুহূর্তও আমাকে তাহারা সেস্থানে থাকিতে দিল না। কঠোর-কণ্ঠে তাহারা আমাকে বারম্বার সাবধান করিয়া দিল, এবিষয়ের কোন কথা যেন বাহিরে প্রকাশ করিতে আমি বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কোনদিন না করি। আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া সে গৃহ ত্যাগ করিলাম। আসিবার সময়ে হঠাৎ আমার চোখে পড়িল, নিহত বালকের পার্শ্বে যে রক্তাক্ত অসিটি পড়িয়া আছে. তাহার উপর বরেন্দ্রভূমির দেববংশীয় মহানায়ক-গণের কুল-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে!...

দুর্জয়দেব ও বিগ্রহদেবের প্রজানিগ্রহের কথা লোকপরম্পরায় পূর্বেই আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম। কুটিরে দৃষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় যে এই দুই সহোদর, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাম্রলিপ্তির পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও আমি কর্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। চোখের সম্মুখে এত বড় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও প্রাণভয়ে নীরব হইয়া থাকা কিছুতেই পুরুষোচিত বলিয়া আমার মনে হইল না। একবার মহাপ্রতীহারের প্রাসাদের দিকে যাইতে গিয়া সেরাত্রে আমি অর্ধপথে ফিরিয়া আসিলাম। স্থির করিলাম, পরদিন প্রভাতে সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করার পূর্বে আমি অতি গোপনে মহাপ্রতীহারকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া যাইব।

কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যূষে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আমি পোতাশ্রয়ের দিকে যাইতেছিলাম, তখন কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আমাকে বন্দী করিয়া এই পাটলিপুত্রে—এই অন্ধকূপে—আমার এই জীবন্ত সমাধিতে—লইয়া আসিল। তাহারা যখন আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, তখন পূর্বদিনের পরিচিত সেই দুই ব্যক্তি রাজপথে অশ্বপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের গর্বিত, উদ্ধত দৃষ্টি—সৈনিকগণের

প্রতি তাঁহাদের হস্তের ইঙ্গিত—আমি দেখিলাম। তাঁহাদের নিষ্ঠুর হাসি ও অবজ্ঞায় কুণ্ঠিত অধরপ্রান্ত যেন অগ্ন্যুত্তপ্ত লৌহশলাকায় আমার মর্মে বিদ্ধ হইয়া গেল। বহির্জগতের সঙ্গে সেই আমার শেষ পরিচয়—তাহার পর জীবিত পৃথিবীর কোন সংবাদ আমার নিকটে আর পেঁছায় নাই। আমার সংবাদও পৃথিবীতে কেহ আর পায় নাই।

আমার শ্রান্তি—আমার ক্লান্তি—আমার অবসাদের—যেন আর সীমা নাই। আশা আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অন্ধকারাগার হইতে মুক্তি পাইবার কোন সম্ভাবনাই আমি আর দেখিতেছি না! আমি বাঁচিয়া আছি, কি মরিয়া গিয়াছি, আমার পরিবারবর্গ হয়তো তাহাও জানে না! জানিলেই বা প্রবল পরাক্রান্ত মহানায়কগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহারা আমাকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে? আমি যে পাটলি-পুত্রের অন্ধকূপে বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়া আছি, হয়তো আমার পত্নী সেকথাও কোনদিনই জানিতে পাইবে না! এই নিদারুণ অন্ধকারে আমার তরুণী পত্নীর প্রেমলাবণ্যে মণ্ডিত মুখ মনে পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। অকস্মাৎ সুখস্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার দিন কেমন করিয়া কাটিতেছে কে জানে? আর আমার কন্যা—আমার সুনন্দা?—এই দশবৎসর তাহারও কোন সংবাদই আমি পাই নাই!

...অত্যাচারীর চক্রান্তে আমি বিনা অপরাধে জীবন্মৃত হইয়া আছি। তবুও যদি আমার স্ত্রীকন্যার সংবাদ একটিবারের জন্যও আমাকে জানাইয়া দেওয়ার মত দয়া এই মহানায়কদের পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া দেখা দিত, তাহা হইলেও আমি বুঝিতে পারিতাম, ইহাদের মনুষ্যত্ব এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে হয়তো ইহাদের ক্ষমা আমি করিলেও করিতে পারিতাম। কিন্তু নিজেদের স্বার্থের জন্য আমাকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিবার পর আমার কথা তাহারাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে! আমার যন্ত্রণা—আমার কাতরতা—আমার নৈরাশ্যের এতটুকু মূল্যও তাহাদের নিকটে নাই!

...আমার এই জীর্ণ পত্র যখন অপরের হাতে পড়িবে, হয়তো ততদিনে আমি এবং আমার সুখদুঃখ দুই-ই ধূলি হইয়া ধূলিতে মিশাইয়া যাইব। কিন্তু আজ হউক, কাল হউক, লক্ষ শতাব্দী পরে হউক, এই স্তূপীকৃত

অত্যাচার এবং অন্যায়ের বিচারের মহামুহূর্ত একদিন আসিবে—সেই দিনের জন্য আমার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা, আমি বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া এই ভূর্জপত্রে লিখিয়া রাখিয়া গেলাম। এই মহানায়কবংশের প্রতিটি রক্ত-বিন্দু বিষাক্ত—ভোগে, স্বেচ্ছাচারে, স্বার্থান্ধতায়, মানুষের প্রতি ঘৃণায় ইহাদের মনুষ্যত্ব বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত ক্ষোভের শক্তি—আমার সমস্ত আশাভঙ্গের দাবদাহ দিয়া আমি অভিশাপ দিয়া যাইতেছি—এই বংশের শেষ রক্তকণা যেন পৃথিবী হইতে সেদিন নিঃশেষে মুছিয়া যায়! দেবতা ও মানুষের অভিশাপ ইহাদের অহর্নিশি অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে, দেবতা বা মনুষ্যের নিকটে কোন ক্ষমা যেন ইহারা বা ইহাদের বংশধরগণ সেদিন না পায়!"

অভিযোগ-পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে সহদেব মুখ তুলিয়া চাহিল। বিচারসভায় প্রবেশ করার পরে এই প্রথমবার তাহার চক্ষুতে অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "দেবাদিদেব মহেশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি শপথ করে বলছি, উমাপতি শ্রেষ্ঠীর এই বিবরণের প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য! কত যে সত্য, সেকথা হয়তো তিনিও তেমন করে জানেন না, আমি যেমন জানি। জানবার যথেষ্ট কারণ আমার ছিল মহা-সামন্ত! উমাপতি শ্রেষ্ঠী সেই রাত্রে যে ধর্ষিতা নারীকে দেখেছিলেন, সে হতভাগিনী আমারই সহোদরা ভগ্নী—যে কিশোর বালক তাকে রক্ষা করতে গিয়ে সুরথদেবের পিতা ও পিতৃব্যের হস্তে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল, সে আমারই কনিষ্ঠ সহোদর! মহাসামন্ত! উমাপতি শ্রেষ্ঠীর কাহিনীর বাকী অংশগুলি আমি পূরণ করে দিয়ে যাব কি? আমার ভগ্নীর রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বিগ্রহদেবের পশুত্ব তাকে কামনা করেছিল। কিন্তু দরিদ্র হ'লেও আমার বোনের আত্মসম্মানবোধ ও পবিত্র-তার অভাব ছিল না—তাই শত প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শনেও সে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। ফলে, এই নরপশু আমার চিররুগ্ন ভগ্নীপতিকে বলপূর্বক তার প্রমোদোদ্যানে নিয়ে গিয়ে সাতদিন পর্যন্ত তাকে দিয়ে প্রখর রৌদ্রে মাটি ভাঙবার কাজ করায়। তার মনে হয়তো আশা ছিল, এত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হতভাগ্য যদি তার পত্নীকে ভূস্বামীর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে অনুরোধ করে, তবে আমার ভগ্নী স্বামীর আদেশ কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু তার সে আশা সফল হলো না। সাতদিন পর

বেলা চতুর্থ প্রহরে আমার ভগ্নীপতি মূর্চ্ছিত হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙল না। তখন বিগ্রহদেব তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে সদ্যোবিধবা ভগ্নীকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেল—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিল! আমার বৃদ্ধ পিতার কাছে এ সংবাদ যখন পৌঁছালো, তখন তিনি শুধু স্তম্ভিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। একটিও আর্তনাদের ধ্বনি তাঁর কণ্ঠ হতে নির্গত হওয়ার পূর্বে অসীম যন্ত্রণায় তাঁর হৃৎস্পন্দন চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে গেল!”

দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া সহদেব ভীমস্বরে বলিতে লাগিল, “সেইদিন—সেই মুহূর্তে পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করে আমি শপথ করেছিলাম, এই মহানায়কবংশকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে আমি মুছে ফেলে দেব—তাদের রক্তধারা পুনর্বার প্রবাহিত হয়ে যাতে আমাদের সামাজিক জীবন অধিকতর কলঙ্কিত করে না তোলে, তাই-ই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। সেইদিন থেকে এই নিদারুণ প্রতিহিংসা-ব্রত আমার দিবারাত্রির সঙ্গী হয়ে আছে। আমার পূতচরিত্রা ভগ্নী, তার নিরপরাধ স্বামী, মহানায়কের অত্যাচারে মাতৃগর্ভে নিহত তাদের সেই অজাত শিশু সন্তান—আমার বৃদ্ধ পিতা ও কিশোর ভ্রাতার মুখচ্ছবি প্রতিমুহূর্তে আমাকে এ ব্রতে প্রেরণা দান করেছে। কত দীর্ঘ বৎসর, কত শত দীর্ঘ দিন ধরে—তিলে তিলে, আমি এর জন্য সমিধ্ সংগ্রহ করেছি। আজ শূলীশম্ভুর কৃপায় আমার সেই প্রতিহিংসা-যজ্ঞ সমাপ্ত-প্রায়। মহাসামন্ত! বিষাক্ত রক্তে যার জন্ম, তার নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে বিষই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যায় আর অত্যাচারের রক্তধারা যার দেহে প্রবাহিত, তার প্রকৃতিগত ধর্ম অন্যায় এবং অত্যাচার-পন্থীই হয়ে থাকে। সুরথদেবের দেহের রক্ত যে কতদূর কলুষিত, সে বিষয়ে আমার অভিযোগের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী উমাপতি শ্রেষ্ঠী—উমাপতি শ্রেষ্ঠীর অভিযোগের চরম সাক্ষী আমি। আজ মহাশ্রেষ্ঠী কন্যাস্নেহে অন্ধ হয়ে যা-ই বলুন না কেন, তাঁর প্রকৃত মনোভাব ও বিশ্বাস—যা এই ভূর্জপত্রে ব্যক্ত হয়েছে—তা আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে। দেহের এক অংশে পচনশীল ক্ষত জন্মগ্রহণ করলে আমরা যখন সম্পূর্ণ দেহটিকে রক্ষা করার জন্য একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে উদ্যত হই, তখন সে চেষ্টা আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনারই

পরিচয় দেয়—নির্মমতার নয়। একথা স্মরণে রেখে আমি আপনাকে সুরথদেবের বিচার করতে অনুরোধ করছি!"

সহদেব যখন আসন গ্রহণ করিল, তখন জনতার অথবা বন্দী ও তাহার আত্মীয়দের মনে বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আর অবশিষ্ট ছিল না। যতক্ষণ লিপিকার উমাপতি শ্রেষ্ঠীর স্বহস্ত লিখিত ভূর্জপত্রগুলি সভার সম্মুখে পাঠ করিয়া শুনাইতেছিল, ততক্ষণ সুরথের গভীর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি একবার সুনন্দার—একবার উমাপতির চক্ষু সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। এতদিনে সুরথ বুঝিতে পারিতেছিল, কেন তাহার সহিত পরিচয়ের প্রথম দিনগুলিতে মাঝে মাঝে উমাপতির মুখ অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া যাইত—মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কেন তিনি হঠাৎ উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন! কেন যে তাহার বারম্বার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পিতৃবংশের পরিচয় উমাপতি তাহাদের বিবাহের পূর্বে শুনিতে চান নাই, সেকথাও সুরথের নিকটে এখন পরিষ্কার হইয়া গেল। কন্যার সুখের জন্য কি অপরিমেয় বিদ্বেষ তিনি তিলে তিলে জয় করিয়াছিলেন, সে-কথা বুঝিয়া পিতৃ-হৃদয়ের বিপুল স্নেহের সম্মুখে সুরথের মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। সুনন্দাও মাঝে মাঝে চকিত কটাক্ষে তাহার পিতার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু অভিযোগপত্রের প্রথম উল্লেখের পর হইতে উমাপতি যেন প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর কোন কথা অথবা কোন মন্তব্যই আর তাঁহার মৃত্তিকার উপরে আবদ্ধ দৃষ্টিকে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হয় নাই।

আরতি-প্রদীপের মত দুটি নেত্র সুরথের মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া সুনন্দা একখানি অচঞ্চল লাবণ্য ও মাধুর্যের প্রতিমার মত স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। সহদেবের সুস্পষ্ট অভিযোগের পর হইতে সুরথের বিরুদ্ধে জনতার বিদ্বেষ সভাস্থলে ক্রমে যত ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, উত্তাল জনতরঙ্গ—আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা—সকল উপেক্ষা করিয়া কেবল দৃষ্টির মধ্য দিয়া এই দুইটি তরুণ হৃদয় যেন ততই উভয়ে উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ধরিল। সুনন্দার প্রশান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি হইতে যন্ত্রণার সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—কেবল অপরিসীম করুণা এবং অপরিমেয় স্নেহ তাহার নয়নপ্রান্তের অশ্রুবিন্দুটিতে টলটল করিতেছিল। সে দৃষ্টির অপরাজেয় প্রেম যেন সকল গ্লানি হইতে সুরথকে ঊর্ধ্বে ধারণ

করিয়া রাখিয়া তাহার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতেছিল। নগরমুখ্য যখন পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে সুরথের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া গেলেন, তখনও সুনন্দার আকৃতিতে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না। প্রেমস্নিগ্ধ দুটি চক্ষু প্রহরীর দিকে তুলিয়া সে গভীর আবেগে বলিয়া উঠিল, "ভদ্র—কেবল একটিবার আমার স্বামীর নিকটে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে অনুমতি দাও, তাঁর কাছে থেকে আমাকে একবারটি শুধু বিদায় নিয়ে যেতে দাও!—তাতে তো তোমার কোনই ক্ষতি হবে না?"

তখন সভামণ্ডপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সুনন্দার মহিমোজ্জ্বল মূর্তির দিকে চাহিয়া প্রহরী এই ক্ষণিক সাক্ষাতে আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। অপরাধমঞ্চ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুরথ গভীর আগ্রহে সুনন্দার কোমল হাত দুটি এই শেষবারের মত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। "বিদায় সুনন্দা! বিদায় আমার চির-প্রিয়তমা! তোমাকে পেয়ে আমি বড় সুখীই হয়েছিলাম! আমার চিরবাঞ্ছিতা তুমি, আমার জীবন সুখে, সৌভাগ্যে পূর্ণ করে দিয়েছিলে! এজীবনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম, জন্মান্তরে তোমাকে ফিরে পাবার সাধনাই আবার করব। সুদেবকে আমার হয়ে একটি স্নেহচুম্বন দিয়ো। আমার হয়ে তুমিই তাকে মানুষ করে তুলো। এবার তবে যাই সুনন্দা! ইহজীবনে না যদি হয়, পরলোকে আবার দেখা হবে!"

পাংশু অধরে মধুর, করুণ হাসিয়া সুনন্দা গভীরতর আবেগে সুরথের হাত চাপিয়া ধরিল। গভীর প্রেমে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "তুমি যাচ্ছ, যাও! আমারও আর বেশী দেরী হবে না। তুমি আমার সর্বস্ব! তোমাকে হারিয়ে বেশী দিন আমি বাঁচব না। স্বর্গে আমার জন্য তুমি প্রতীক্ষা কোরো, বাসুদেবের কৃপায় শীঘ্রই আমরা আবার সেখানে মিলিত হবো, প্রাণাধিক!"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রহরীর দল আসিয়া সুরথকে প্রায় ছিনাইয়া লইয়া গেল। মুক্তদ্বারপথে যতক্ষণ সুরথের মূর্তি দেখা গেল, সুনন্দা দুটি হাত যুক্ত করিয়া কোমল, সপ্রেম দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে তখন যে অপার্থিব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বারম্বার ফিরিয়া চাহিয়া সুরথ তাহার হৃদয়ে সেই অপূর্ব

সুষমা এবং ঔজ্জ্বল্যের চিত্রই সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল। তাহার মূর্তি দৃষ্টির অন্তরালে অপসারিত হইয়া যাওয়া মাত্র সুনন্দা যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল, তাহা আর সুরথ দেখিতে পাইল না।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

মূর্চ্ছিতা সুনন্দার দেহ বহন করিয়া উমাপতির শিবিকা যখন জয়ন্তের গৃহদ্বারে গিয়া পেঁছিল, তখন গৌরীপতির মুখে সকল কথা শুনিয়া জয়ন্ত ধীরে ধীরে কেবল বলিল, "এ আমি জানতাম!"

নিদারুণ হতাশায় এই ক্ষুদ্র গৃহটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মঙ্গলার হাতে সুনন্দার পরিচর্যার ভার দিয়া গৌরীপতি জয়ন্ত ও উমাপতির নিকটে আসিয়া বসিলেন। উমাপতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন—বিচারসভা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে বা পরে তিনি আর এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই। জয়ন্তও স্তব্ধ হইয়া আপনার চিন্তা-রাশিতে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। গৌরীপতি একবার সুনন্দার দীর্ঘ মূর্চ্ছা লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করাতে সে করুণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ মূর্চ্ছা ওঁর যতক্ষণ থাকে থাক—তার জন্য ব্যস্ত হবেন না। পূর্ণজ্ঞানে যন্ত্রণা ভোগের অসহ্য কষ্টের চেয়ে এই অজ্ঞান অবস্থা ওঁর পক্ষে অনেক বেশী ভালো!" তাহার কণ্ঠের অপূর্ব কোমলতায় গৌরীপতি বিস্মিত হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন। আবার কিছুক্ষণ অখণ্ড নিস্তব্ধতায় কাটিয়া গেল। ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে এই পরিবারটি যেন সমস্ত চিন্তাশক্তি ও চেষ্টা হারাইয়া জড়মূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিতেছিল না।

বহুক্ষণ এইরূপ নীরবে কাটিয়া যাওয়ার পরে, জয়ন্ত কোমলস্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল, "মহাশ্রেষ্ঠী!" উমাপতি কোন সাড়া দিলেন না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া জয়ন্ত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কোমল স্বরে বলিল, "নগরমুখ্যের দণ্ডাদেশের পর সুরথের প্রাণরক্ষার কোন আশাই আমি আর করিনে। তবু বলছি, কাল আপনি তাকে রক্ষা করেছিলেন,

আজও যদি তাকে বাঁচাবার সাধ্য কারুর থেকে থাকে, তাহ'লে এখনও কেবলমাত্র আপনারই আছে। জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যাঁরা সুরথের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে সাহস করেননি, তাঁদের কাছে আপনি নির্জনে সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বললে তাঁরা হয়তো এখন আপনাকে সাহায্য করলেও করতে পারেন। অবশ্য সাহায্য যে তাঁরা করবেনই, সেবিষয়ে আমি বিশেষ আস্থাবান নই। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্যই আমি আপনাকে বলছি—আজ, এখনই, নগরের মহারথীদের নিকটে যাওয়া কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে?"

মুখের উপর হইতে হস্তের আচ্ছাদন সরাইয়া উমাপতি ধীরে ধীরে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি তো তার পুনর্বার বন্দীত্বের কোন আশঙ্কাই করিনি? নাগরিকগণের নিকট থেকে সুরথের জীবন আমি যে কাল ভিক্ষা করে এনেছিলাম! সুনন্দাকে জোর করে বলেছিলাম, সুরথকে আমি তার হাতে ফিরিয়ে এনে দেব—দিয়েও ছিলাম তাই। আজ আবার এ কি হলো?"

কণ্ঠস্বরে সান্ত্বনা ভরিয়া জয়ন্ত বলিল, "কাল আপনার যে শক্তি এত কার্যকরী হয়েছিল, আজও তো তা সুরথকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হতে পারে? কিন্তু কেন, কি হয়েছে, সেকথা চিন্তা করবার সময় আজ আর নেই মহাশ্রেষ্ঠি! সুরথের জন্য যদি কিছু করার ক্ষমতা আপনার হাতে থাকে, তাহ'লে এখনই আপনাকে তা করতে হবে। না হ'লে এর পরে বেশী বিলম্ব হয়ে গেলে কিছুতেই আর কোন ফল হবে না।"

জয়ন্তের কথায় আশার যে ক্ষীণ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, উমাপতির অবসন্ন দেহে তাহাই যেন বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি এখনই যাচ্ছি! নগরমুখ্যের ও প্রতীহারদের সঙ্গে এখনই আমি সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করব। প্রয়োজন হ'লে সেনাপতি সহদেব—এমন কি মহারাজ দিব্যোকের কাছেও যাব। কোন চেষ্টাই আমি আর অবশিষ্ট রাখব না। জয়ন্ত, তুমি ঠিকই বলেছ—এখনও হয়তো সুরথের জন্য আমার কিছু করার আছে"—

অস্নাত, অভুক্ত উমাপতি আর মুহূর্তকালও বিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গৌরীপতির জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া জয়ন্ত একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিল। "বুঝতে পারছেন না? মহাশ্রেষ্ঠীর জ্ঞান এই আকস্মিক আঘাতে পুনরায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কাতেই সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল জেনেও তাঁকে আমি উৎসাহ দিয়ে পাঠিয়েছি। অনবরত কর্মে ব্যাপৃত হয়ে থাকা এখন তাঁর নিজের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন...না, না, এদিকে কোন আশাই এখন আর নেই। বিচারসভায় সহদেবের অভিযোগ ও মহাশ্রেষ্ঠীর স্বহস্ত-লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরে পাটলিপুত্রের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও আর সুরথের জন্য একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করতেও সাহস করবে না। সুরথের মৃত্যু এখন সুনিশ্চিত—তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারুরই আর নেই।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চঞ্চল হইয়া কক্ষতলে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর সহসা গৌরীপতির অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুত, নিম্নস্বরে বলিল, "এসব অনর্থক আলোচনা এখন থাক। আপনাকে আমার কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলবার আছে, তাই আগে মন দিয়ে, ভালো করে শুনুন। সুরথের মৃত্যুদণ্ড তো স্থির হয়েই গিয়েছে—কিন্তু সুনন্দাদেবী বা সুদেব, কারুর জীবনই আর পাটলিপুত্রে নিরাপদ নয়। আজ আপনারা যখন বিচারসভায় গিয়েছিলেন, তখন নগরের পথে পথে ঘুরে যে সংবাদ আমি সংগ্রহ করেছি, তাতে বুঝতে পেরেছি,—অভিজাত-সম্প্রদায়ের বংশধরদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদেরও তারা গৌড়-বঙ্গ থেকে নিঃশেষ করে ফেলতে কৃতসংকল্প হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুনন্দাদেবীর আর সুদেবের নাম উচ্চারিত হ'তেও আমি কোন কোন স্থানে শুনে এসেছি। এ অবস্থায় সুরথের যা-ই হোক না কেন, এ'দের নিয়ে কাল আপনাকে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে যেতেই হবে!"

গৌরীপতি শিহরিয়া উঠিয়া জয়ন্তের দিকে চাহিলেন, তাঁহার কণ্ঠ চিরিয়া একটা অস্ফুট আর্তনাদ বাহির হইয়া আসিল, "সুনন্দা—সুদেব—তুমি এসব কি বলে যাচ্ছ, জয়ন্ত? এদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহীদের আক্রোশ? আর যদি সত্যিই তা হয়, তাহ'লে কেন তুমি উমাপতিকে এখন দূরে পাঠিয়ে দিলে, জয়ন্ত? কালের জন্য মিথ্যা অপেক্ষা না করে আজ রাত্রেই তো আমরা পাটলিপুত্র ছেড়ে চলে যেতে পারতাম! এখন তো আর সুরথদেবকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুরই নেই!"

জয়ন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "না, সুরথদেবকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা এখন সত্যিই কারুরই নেই!" তাহার পর যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া উঠিয়া সে বলিল, "কিন্তু আজ যদি উমাপতি শ্রেষ্ঠী সুরথকে উদ্ধার করতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা না করেই চলে যেতেন, তাহ'লে হয়তো সুনন্দা দেবীর মনে কোন না কোন সময়ে এ বিষয়ে গোপনে কোন অভাব-বোধ বা অভিযোগ দেখা দিলেও দিতে পারতো। তাঁর সান্ত্বনার জন্যও এই চেষ্টার বাস্তবিকই একটা খুব বড় প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া এই বিলম্বে কোনই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুরথদেবের ছিন্ন মুণ্ড শ্মশানে লুটিয়ে পড়ার পূর্বে তার স্ত্রীপুত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর নগরে কোন প্রজারই হবে না। কিন্তু কাল সূর্যাস্তের অন্ততঃ একপ্রহর পূর্বে আপনাদের নগর ত্যাগ-করা চাইই চাই।"

গৌরীপতি তাঁহার কথা অভিনিবেশ সহকারে শুনিতেছেন কিনা দেখিয়া লইয়া জয়ন্ত বলিতে লাগিল, "যাত্রার সমস্ত আয়োজন আপনি কাল প্রভাতেই সম্পূর্ণ করে রাখবেন। নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্ব-শকট পাবার ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে—সেজন্য যত অর্থ প্রয়োজন হয়, দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। কাল রাত্রেই আমি মঙ্গলার নিকটে অনুসন্ধান করে জেনেছি, মহাশ্রেষ্ঠী তাঁর নিজের, সুনন্দাদেবীর, সুদেবের এবং মঙ্গলার জন্য নগর ত্যাগের অনুমতিপত্র ইতিপূর্বেই আনিয়ে রেখেছেন। আগামী কাল পর্যন্তও এগুলি প্রত্যাহারের আশঙ্কা নেই—যদিও তার পরদিন কি হবে, আমি জানি না। যাক, আপনার নিজের অনুমতি-পত্র এই সঙ্গেই আপনি প্রস্তুত করে রাখুন। আমার পত্রটিও আপনার কাছে দিয়ে রাখছি—আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। আপনারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমার জন্য এই গৃহের সম্মুখেই অপেক্ষা করবেন। আমি এসে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ যাত্রা করতে যেন বিন্দুমাত্র বিলম্ব না হয়, এমন ভাবেই সমস্ত আয়োজন আপনাকে করে রাখতে হবে। আপাততঃ যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই থলিটি আপনি রাখুন"—বলিয়া জয়ন্ত একটি গুরুভার রেশমের থলে গৌরীপতির সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

গৌরীপতি একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে, একথা শুনে সত্যই বড় নিশ্চিন্ত বোধ করছি জয়ন্ত! বার্ধক্যের সীমায় উপনীত হয়ে গুরুতর কর্তব্যের দায় গ্রহণ করতে কেন যেন ভয়

হয়! তোমার মত একজন যুবক সঙ্গে থাকলে কোন আশঙ্কার কারণ আমার আর থাকবে না। কিন্তু তোমার অর্থ ও অনুমতি-পত্র তো তোমার কাছেই থাকতে পারত জয়ন্ত? এগুলি আবার আমার হাতে কেন দিচ্ছ?"

জয়ন্ত একটু যেন ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর কণ্ঠস্বর আরও একটু নীচু করিয়া বলিল, "তার একটা গুরুতর কারণ আছে। কথাটা অন্য সকলের নিকটে গোপন রাখব বলেই স্থির করেছিলাম, কিন্তু আপনাকে বলতে কোন বাধা নেই। বজ্রমুখ নামে উজ্জয়িনীর একজন গুপ্তচরকে আপনার মনে পড়ে? সুরথদেবের বিরুদ্ধে যে গুর্জর রাজ্যের মহা-প্রতীহারের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিল? সেই বজ্রমুখ বর্তমানে এখানে এসে ছদ্মনাম নিয়ে আবার গুপ্তচর ও প্রহরীর কাজ করছে, এ সংবাদ আমি জানতে পেরেছি। বজ্রাসন দুর্গেই বর্তমানে সে প্রহরীরূপে নিযুক্ত হয়ে আছে। গুর্জর সাম্রাজ্যের গুপ্তচর হয়েও সে ছদ্মপরিচয়ে গৌড় রাজ্যের চর ও প্রহরী হয়েছে, এ সংবাদ আমি প্রকাশ করে দিলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সেই দণ্ডে তার শূল হয়ে যাবে, একথা সে জানে। তাই সে আমাকে কাল বিকালে একবার সুরথদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। বজ্রাসনের কঠিন প্রহরা এড়িয়ে কোন ছলে সুরথকে উদ্ধার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সে প্রশ্ন একেবারে না তুলেই শেষ মুহূর্তে আমি একবাব সুরথের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাই। যদি তার কোন কথা সুনন্দাদেবীকে বলে পাঠাবার থাকে—কিম্বা কোন শেষ ইচ্ছা, অথবা কোন চিঠি! কিন্তু কারাগারের মত বিপদসঙ্কুল স্থানে অর্থ বা অনুমতিপত্রের মত অতি প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে যেতে আমার আশঙ্কা হয়। তাই আমি এগুলি আপনার কাছেই বেখে যেতে চাচ্ছি।"

গৌরীপতি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "জয়ন্ত, তুমি মহৎ, তোমার অন্তঃকরণের তুলনা নেই! উমাপতির কথা—সুনন্দার কথা প্রতিমুহূর্তে তুমি এমন করে ভাব্‌ছ? আমার স্বীকার করতে সত্যই লজ্জা বোধ হচ্ছে পাটলিপুত্রে আসবার পূর্বে তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাল ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, উমাপতি তোমাকে চিনতে পেরে-ছিলেন বলেই স্নেহ করতেন, আমিই তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলাম! তুমি সেজন্য আমায় ক্ষমা কর।"

জয়ন্তের মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। সে বলিল, "ক্ষমাপ্রার্থনার কিছুই নেই আর্য! আপনি আমাকে এতদিন যা ভেবেছিলেন সেটাই সত্যি —আজ যা মনে করছেন এটাই ভুল। মহত্বের কিছুই আমার মধ্যে নেই। আমি বড় উচ্ছৃংখল, আমার খেয়াল আমাকে যখন যেদিকে নিয়ে যায়, আমি সেই পথে চলি।"

তারপর সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তিত করিয়া লইয়া সে বলিয়া উঠিল, "আর্য, আপনার মাকে আপনার মনে পড়ে?"

গৌরীপতি এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পড়ে নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছ যে?"

অন্যমনা হইয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্ত ধীরে ধীরে বলিল, "কেন জানি না, কাল থেকে আমার মার কথা বার বার আমার মনে পড়ছে। মার সেই উজ্জ্বল মুখের মধুর সুন্দর হাসিটি কেবল আমার চোখের সম্মুখে ভাসছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে অনেকদিন আগে মাকে যেমন দেখতাম, আমার প্রতীক্ষায় একটি প্রদীপ জেবলে নীরবে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সেই মূর্তিটিই যেন আমি চোখের উপরে দেখতে পাচ্ছি।"

তারপর একটু হাসিয়া সে পুনরায় বলিল, "শিশু হয়ে মায়ের কোলে যখন যেতাম, তখন আমি যেমন সুন্দর, যেমন পবিত্র ছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেক নীচে নেমে গিয়েছি। আমার মা যদি এখন আমাকে দেখতে পেতেন, তবে কি এখনও তেমনি করে আমাকে বুকে টেনে নিতেন? না অন্যান্য সকলের মত তিনিও আমাকে নীচ বলে, অপদার্থ বলে ঘৃণা করে দূরে ফেলে দিয়ে চলে যেতেন?"

কান্নার চেয়েও করুণ একটি হাসিতে জয়ন্তের মুখ ভরিয়া গেল। সে হাসি দেখিয়া গৌরীপতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন কথা বলিবার ক্ষমতা তাঁহার আর হইল না।

অনেকক্ষণ পরে জয়ন্ত বলিল, "মহাশ্রেষ্ঠী তো এখনও এলেন না? আমি তাহলে এখন একবার ঘুরে আসি। সন্ধ্যার দিকে আবার এসে সমস্ত সংবাদ জেনে যাব। আপনি কিন্তু আমাদের আলোচনার একটি কথাও ভুলবেন না। কি কি করতে হবে, সব আপনার মনে আছে তো?"

—"হ্যাঁ, আছে। এমন সময়েও যদি না থাকবে, তবে আর কি করে

চলবে জয়ন্ত? কাল বৈকালে সূর্যাস্তের এক প্রহর পূর্বে আমি উমাপতি এবং তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রকে নিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগামী অশ্বশকট নিয়ে এই প্রাঙ্গণের সম্মুখে তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। তুমি এলে তৎক্ষণাৎ আমরা সকলে নগর পরিত্যাগ করে যাব। কেমন, এই ব্যবস্থাই ঠিক তো?"

অপূর্ব জ্যোতিতে মণ্ডিত, স্নিগ্ধ দুই চক্ষু গৌরীপতির মুখের উপরে রাখিয়া জয়ন্ত ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ, আমার স্থান পূর্ণ হওয়া মাত্র আপনারা আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ পাটলিপুত্র ত্যাগ করবেন। আমার একটি কথা স্মরণ রাখবেন আর্য, যদি কাল আমার ব্যবস্থা মত কাজ না হয়—যদি কারুর কথা মনে করে—সে যে-ই হোক না কেন—তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করতে গিয়ে আপনারা আর তিলমাত্র বিলম্বও করেন—তাহলে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু একবিন্দু লাভও কারুর হবে না। আমি যে অবস্থায় ফিরে আসি না কেন, আমার স্থান আমি এসে গ্রহণ করা মাত্র আপনি শকটচালককে দ্রুতবেগে পশ্চিম তোরণাভিমুখে অশ্বচালিত করতে আদেশ দেবেন। আর্য, বলুন, আমার এই অনুরোধ আপনি অবহেলা করবেন না?"

গৌরীপতি বলিলেন, "আমার দেহে যতটুকু শক্তি আছে, তা দিয়ে তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করব। কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করব তা তো বলনি জয়ন্ত? যদি কাল কোন কারণে এসে পৌঁছাতে তোমার বিলম্ব হয়?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জয়ন্ত বলিল, "সূর্যাস্তের অর্ধপ্রহর পূর্ব পর্যন্ত আমার জন্য আপনারা প্রতীক্ষা করবেন। তার মধ্যে আমি— আস্‌ব। আর ভগবান্ বুদ্ধের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হয়, ফিরে আসার সুযোগ আমার যদি না ঘটে, তাহ'লেও ঐ সময়ের পরে আপনাদের আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই। তাহ'লে অগত্যা সুনন্দাদেবী এবং তাঁর পিতা ও পুত্রকে নিয়েই আপনি যত শীঘ্র সম্ভব নগর ত্যাগ করে চলে যাবেন।"

—"আর তুমি?"

স্নিগ্ধ অধরে জয়ন্ত মৃদু মৃদু হাসিল। "আমার মত একটা অপদার্থের জন্য তিনটি মহামূল্য জীবন কেন বিপন্ন করবেন আর্য? আমার নিয়তি

আমাকে যে পথে টেনে নিয়ে যায়, যাবে। তার জন্য দুঃখ কি?"

তারপর ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া সে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাছাড়া আমার প্রাণের জন্য বাস্তবিক কোন আশঙ্কা আপনাদের নেই। আমি যে বিদেশী!"

"তাও বটে!" গৌরীপতি জয়ন্তের মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। আজ জয়ন্তের এই নূতন মূর্তিটিকে তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাহার কথায় ও ব্যবহারে মাঝে মাঝে একটি গোপন রহস্যের সুর অনুভব করিতে পারিলেও তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তিনি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

জয়ন্ত তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নিকটে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর একটি কথা, আমি যে কাল সুরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বজ্রাসন দুর্গে যাচ্ছি, এ কথা মহাশ্রেষ্ঠী বা তাঁর কন্যার নিকটে আপনি প্রকাশ করবেন না। হয়তো তাতে তাঁদের মনে একটা অলীক আশা জন্মাবে, তাঁরা অনর্থক বিচলিত হয়ে আরও বেশি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। তার কিছুই প্রয়োজন নেই। সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছে, একথা নিশ্চিত জানাই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল।"

গৌরীপতি নীরবে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। তাঁহার প্রতি একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জয়ন্ত বাহির হইয়া গেল।

* * * *

বহুক্ষণ পরে জয়ন্ত যখন পুনরায় ফিরিয়া আসিল, তখনও গৌরীপতি উমাপতির প্রতীক্ষায় নীরবে সেই স্থানেই বসিয়া আছেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া পাটলিপুত্রের পথ-ঘাট অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। উমাপতি তখনও ফিরিয়া আসিলেন না। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, রাজপথের সমস্ত শব্দ ক্ষীণ হইতে হইতে ক্রমে সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল—সুরথের সংবাদ লইয়া উমাপতি তখনও আসিয়া পেঁছিলেন না। স্তব্ধ গৃহে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া একটি বৃদ্ধ এবং একটি যুবক আশঙ্কাতুর হৃদয়ে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রহরের পর প্রহর যতই অতিক্রান্ত হইতেছিল, সমস্ত আশা যে শেষ হইয়া গিয়াছে, এ নিষ্ঠুর সত্য তাঁহাদের নিকট ততই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।......

দ্বারের নিকটে উমাপতির পদশব্দ শুনিয়া জয়ন্ত এবং গৌরীপতি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। পিতার আগমন বুঝিতে পারিয়া সুনন্দাও অসুস্থতা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু উমাপতি যখন টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াছেন, সেকথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। 'কি হইল', এ প্রশ্নটিও উমাপতিকে কেহ করিতে পারিল না—কেবল সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নীরব হইয়া রহিল।

উমাপতির শ্রান্ত, অবসন্ন মুখের উপরে যে ক্লান্তির চেয়েও অনেক নিদারুণ একটি তুহিন শীতল পাণ্ডুরতা ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, সুনন্দাই প্রথমে তাহা লক্ষ্য করিল। সে বিবর্ণতার প্রকৃতি চিনিতে তাহার ভুল হইল না। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে উমাপতির নিকটে গিয়া তাঁহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সুনন্দা কোমল স্বরে ডাকিল, "বাবা!" সেই আহ্বানে উমাপতি যেন আহত মৃগের ন্যায় শিহরিয়া উঠিয়া তাহার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে সবলে মুক্ত করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। যন্ত্রণাহত ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "সরে যা সুনন্দা! সরে যা! আমার মুখ আর দেখিসনে! তোর মুখ আমাকে আর দেখাস নে! তোকে দেখলে অনুতাপে, যন্ত্রণায়, আমার বুক ফেটে যেতে চায়! তোর এ দুর্দশার জন্য যে আমিই দায়ী, এ কথা আমি কেমন করে ভুল্‌ব? বাসুদেব, দয়াময়! কেন এ নিদারুণ প্রতিহিংসার আগুন আমার মনে তুমি জেলে দিয়েছিলে? আমার তীব্র অভিশাপ যে একদিন আমার সন্তানের বিরুদ্ধেই শাণিত অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে, একথা কেন সেদিন বুঝতে দাওনি?"

আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া সুনন্দা বলিল, "বাবা, বাবা! ও কথা তুমি বোলো না। তোমার দোষ কি? বাসুদেবের যা ইচ্ছা, তাই-ই হয়েছে। কেন তুমি সেজন্য অনর্থক এত যন্ত্রণা ভোগ করছ?"

উমাপতি তাঁহার কথা শুনিতেও পাইলেন না। স্তব্ধ হৃদয়ে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আজ সমস্ত দিন, সমস্ত রাত পাটলিপুত্রের পথে পথে কত ঘুরেছি। কিন্তু আমার শত অনুরোধেও কেউ সুরথের হয়ে একটি কথা বলতেও সম্মত হলো না। ঐ ক'খানি বিবর্ণ ভূর্জপত্র আমার সমস্ত

শক্তি হরণ করে নিয়েছে!" বলিতে বলিতে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। "সুনন্দা! সুনন্দা! মা আমার! তোমার জীবনের সমস্ত সুখ আমিই হরণ করে নিলুম! এই জন্যেই কি তুমি এত করে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছিলে?"

গৌরীপতি, সুনন্দা ও জয়ন্ত ত্রস্তপদে তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা উমাপতিকে তুলিয়া ধরিবার পূর্বেই দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের চোখের সম্মুখে তাঁহার দেহ যেন যন্ত্রণায় কুঁকড়াইয়া ছোট হইয়া গেল। স্তম্ভিত গৌরীপতি দেখিলেন, যে উমাপতিকে তিনি বহুদিন পূর্বে পাটলিপুত্রের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই উমাপতি অকস্মাৎ যেন মন্ত্রবলে তাঁহার সম্মুখে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন! সুনন্দার পিতা উমাপতি, সম্ভ্রান্ত নাগরিক উমাপতি, সৌম্য, প্রশান্ত উমাপতি—এই ছয় বৎসরে তাঁহার প্রতিপল-পরিচিত বন্ধু—কোথায় হারাইয়া গিয়াছেন, সম্মুখের শীর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর দেহে তাঁহার কোন চিহ্নও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না!

উন্মাদ অনবরত অসংলগ্ন বকিতে লাগিল, কাতর কণ্ঠে মুক্তি চাহিয়া গৃহের অভ্যন্তরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় ভিত্তিগাত্রে মাথা ঠুকিয়া আপনাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। দেখিয়া সুনন্দা সকল ভুলিয়া পিতার নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার পরিচর্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। জয়ন্ত সুনন্দার সঙ্গে কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিল না, শুধু দূর হইতে একাগ্র স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া যেন তাহার কোমল করুণ মুখখানি মনে মনে আঁকিয়া লইতে চাহিল। সে চাহনিতে যে সুপ্রচুর অনুরাগ ও আত্মদানের কামনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, গৌরীপতি তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া জয়ন্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অতি মধুর হাসিল। যাহার হৃদয় হইতে সমস্ত স্বার্থ ও আসক্তি দূর হইয়া গিয়াছে, সমস্ত বন্ধন-মুক্ত হইয়া যে মহাসমুদ্রের দিকে ভাসিতে চলিয়াছে, জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সে-ই কেবল এমন হাসি হাসিতে পারে। গৌরীপতির অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার একখানি হাত নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়া সে চুপি চুপি বলিল, "আমার কথাগুলি মনে রাখবেন!" তারপর ধীরে

ধীরে বাহির হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। গৌরীপতি আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

গৌরীপতির নিকট বিদায় লইয়া গেলেও জয়ন্ত তখনই সে স্থান ত্যাগ করিয়া যায় নাই। সেই রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত সে এই ক্ষুদ্র বাটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু সে কথা অপর কেহ জানিত না।

অন্ধকার উদ্যানের একটি ছায়াময় স্থানে আত্মগোপন করিয়া জয়ন্ত সুনন্দার আলোকিত কক্ষটির দিকে চাহিয়া ছিল। উজ্জ্বল বাতায়ন-পথে সুনন্দার অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তির দিকে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, "তোমার ওই মধুর মুখটি আমি আর দেখ্‌ব না, তোমার কোমল কণ্ঠস্বর জীবনে আর শুনতে পাব না! কিন্তু তবুও আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে গিয়ে বিদায় গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার চির-আরাধ্যা দেবী তুমি, তোমার পথের কাঁটা তুলতে গিয়ে যদি আমার এ ব্যর্থ জীবন যায়, তবে তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার কি আছে? আমার স্মৃতিতে তোমার সুন্দর জীবন যেন এতটুকুও মলিন না হয়, এই আকাঙ্ক্ষাই আজ আমি সমস্ত মন দিয়ে দেবতার পায়ে জানিয়ে গেলাম।"

সুনন্দার গৃহের প্রদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল। সেদিকে চাহিয়া যুক্ত করে এই চির প্রিয় জীবনটির কল্যাণ কামনায় বুদ্ধের চরণে একটি শেষ প্রার্থনা জানাইয়া জয়ন্ত আসন্ন ঊষার ছায়াসুন্দর আলোকে নগরের দিকে চলিল। এক অননুভূতপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দে তাহার হৃদয় তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মহানগরীর সমস্ত দেহ আলোক-স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া নবপ্রভাতের নবীন সূর্য শুভ্র কিরণে দ্যুলোক, ভূলোক প্লাবিত করিয়া দিল। রাজপথ কত স্বার্থবাহ, কত অশ্বযান—কত লোক চলাচলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু পাটলিপুত্রের এই বিরাট জীবন-স্পন্দন জয়ন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাহার

তদ্‌গতচিত্ত তখন অন্তরাত্মার নিভৃত কন্দরে এক সুষমাময় মুখচ্ছবি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

অপূর্ব রমণীয় পৃথিবী! অপূর্ব মোহময়ী ঊষা! অপূর্ব শোভাময় উত্তর ভারতের একদা-শ্রেষ্ঠ রাজধানী! কিন্তু জয়ন্তের হৃদয় জুড়িয়া তখন যে ভাব-বিহ্বলতা জাগিয়াছিল, তাহাতেই তন্ময় হইয়া সে পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল—বহির্জগতের এই অপরূপ রূপ-সম্ভারের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

*　　　*　　　*　　　*

বজ্রাসন দুর্গের নিভৃত কারাকক্ষে বসিয়া সুরথ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুর্গতোরণের সুবিশাল লৌহঘণ্টা থাকিয়া থাকিয়া গম্ভীর নির্ঘোষে প্রহর ঘোষণা করিয়া যাইতেছিল। প্রতিপ্রহরের সঙ্গে দিবসের প্রতি দণ্ড, পল, অনুপল কেমন করিয়া তাহার জীবন হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া মহাকাল-সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, নির্বিষ্টচিত্তে সুরথ তাহাই দেখিতেছিল। প্রথম বার পশ্চিমতোরণ হইতে এই দুর্গে বন্দীরূপে আনীত হওয়ার সময় তাহার মনে যে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই এখন আর তাহার দেহে মনে বিদ্যমান ছিল না। সমস্ত চিত্ত সংযত, স্থির করিয়া লইয়া সে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি চাঞ্চল্যে ম্লান না হইয়া বরং অপূর্ব ধৈর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গতোরণে যখন দিবসের তৃতীয় প্রহরের শেষার্ধ বাজিয়া গেল, তখন সুরথ প্রহরীর নিকট হইতে লিখিবার উপকরণ চাহিয়া আনিয়া দুইখানি ক্ষুদ্র পত্র রচনা করিল। প্রথম পত্রে সুনন্দার নিকটে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় হৃদয়ের অপরিবর্তনীয় প্রেম জ্ঞাপন করিয়া সে লিখিল, "আমার মৃত্যুতে তুমি দুঃখ কোরো না। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে আমার জীবন যে এমন করে শেষ হয়ে গেল, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুকের রক্ত দিয়ে আমি করে যাচ্ছি। আশা করি আমাদের স্নেহের দুলাল সুদেব এবার তার পিতৃবংশের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। মহাশ্রেষ্ঠীকে তুমি দেখো। তাঁকে আমার সহস্র সহস্র. কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো বাল্য জীবনে যে পিতৃস্নেহের সৌভাগ্য লাভ করতে কখনও সক্ষম হইনি, তাঁর

কাছে তারই স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। মহাশ্রেষ্ঠীর কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী, তাঁরই অতুলনীয় স্নেহাশীর্বাদরূপে আমার জীবনে তুমি এসেছিলে—তাঁর প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার আমার সীমা নেই। আমার মৃত্যুর জন্য নিজেকে উপলক্ষ্য মনে করে তাঁর জীবন যাতে দুর্বিষহ হয়ে না ওঠে, সে ভার আমি তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। এ বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্নই তুমি কোনদিনই তাঁকে কোরো না। আমার মৃত্যুর কাহিনীকে জীবনের একটি স্মৃতি অধ্যায়ের মত তাঁকে ভুলে থাকতে দিও।"

দ্বিতীয় পত্রে গৌরীপতির নিকটে তাহার স্বোপার্জিত বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সে বারম্বার তাঁহাকে সহায়হীনা সুনন্দা ও তাহাঁর পিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিল, "সুনন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় আপনিই ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, আজ পৃথিবীর নিকট বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে সুনন্দাকে আমি আপনার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আপনার আশ্রয়ে সুদেব-সুনন্দা রয়েছে, একথা জানলে তাদের কথা মনে করে আমার দেহমুক্ত আত্মা কখনই ক্লিষ্ট হবে না।"

বহু যত্নে, বহু চিন্তার ফলে এই দুইখানি পত্র যখন সমাপ্ত হইল, তখন দিবসের চতুর্থ যামও অর্ধ-অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুরথ চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহলোকে তাহার যাহা কিছু করণীয় ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুদণ্ডের কালও আসন্ন প্রায়। তখন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সে একবার বাসুদেবের নাম স্মরণ করিল—একবার সুনন্দার প্রেমকরুণ মুখের ছবি অন্তরের সম্মুখে রাখিয়া গভীর আগ্রহে শক্তি ও সান্ত্বনার সেই অনুপম উৎসটির দিকে চাহিল। তারপর তন্ময় স্থির চিত্ত হইতে সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া দিয়া জীবনের চরম মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দিবসের আলোক রক্তিম হইয়া কারাকক্ষের বাহিরে পিপুলবৃক্ষের ছায়া যখন ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল, তখন সুরথের কারাগৃহের লৌহদ্বার নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। সুরথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, জয়ন্ত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! জীবনের এই শেষ মুহূর্তটিতে তাহার সমগ্র আত্মীয়-বান্ধবের মধ্যে জয়ন্ত যে এমন করিয়া

উঠিল। তাহার অন্তরের প্রশান্তি তাহাকে বলিয়া দিতেছিল, দেবতার প্রসাদ সে লাভ করিয়াছে।

দ্বাবিংশতিতম নরমুণ্ড খড়্গাঘাতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যখন তাহার আহ্বান আসিল, তখন দৃঢ় অকম্পিত পদে সে ধীরে ধীরে মঞ্চে আরোহণ করিতে লাগিল। বন্দীর নাম শুনিয়া শত শত দর্শক মঞ্চাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল, শত শত হস্ত তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য চারিদিকে মশাল তুলিয়া ধরিল। তখনও জয়ন্তের মুখে একটি অপার্থিব প্রসন্নতার অনির্বচনীয় মহিমা ভাসিতেছে।......চারিদিকে জনসমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, বিক্ষুব্ধ জনসিন্ধুর উন্মত্ত কলরোল ডুবাইয়া দিয়া পূর্ণতর নির্ঘোষে দামামা ধ্বনিত হইতে লাগিল।......মশালের আলোকে ঘাতকের হস্তে শাণিত খড়্গ বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল। রক্তোচ্ছ্বাসে বধ্যভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। মহাকালের কৃপাণ তখন ত্রয়োবিংশতিতম বন্দীর মৃত্যু-অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছে।

সমাপ্ত